জন স্টুয়ার্ট মিল

# উপযোগবাদ

বাংলাবুক.অর্গ

অনুবাদ: হাসনা বেগম

জন স্টুয়ার্ট মিল

# উপযোগবাদ

অনুবাদ :

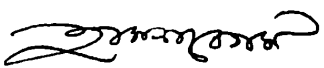

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

বাংলা একাডেমী ঢাকা

প্রথম প্রকাশ
ভাদ্র ১৩৯৫
সেপ্টেম্বর ১৯৮৮

বা.এ. ২১৩৯

মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০

পাণ্ডুলিপি
সমাজবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
মোহাম্মদ ইবরাহিম
পরিচালক
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১০০০

মুদ্রক
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা ১০০০

প্রচ্ছদ
মো: তৌফিকুর রহমান

মূল্য : ২৬·০০

---

UPAYOGBAAD : Bangla translation of John Stuart Mill's ***Utilitarianism***, translated by Dr. Hasna Begum. Published by Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. September, 1988. Price : Taka 26·00 U.S Dollar 2.

উৎসর্গ

বড়মেয়ে শামা রুখ (রিফ্‌ফু)-কে
যার আগ্রহ ও উৎসাহ
আমার এই অনুবাদ-কর্মের প্রেরণা

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

**নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।**

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

BANGLABOOK.ORG © COPYRIGHT , ALL RIGHTS RESERVED

# ভূমিকা

পাশ্চাত্য চিন্তার জগতে জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-১৮৭৩) একটি অনন্য নাম। যুক্তিবিদ্যা, অর্থনীতি, মনোবিদ্যা, অধিবিদ্যা, ধর্ম, শিক্ষা, সাহিত্য, ইতিহাস, রাজনীতি-তত্ত্ব ইত্যাদি বহু বিষয়ে মিলের উল্লেখযোগ্য এবং প্রভাবসম্পন্ন অবদান রয়েছে। তিনি পার্লামেন্টের অধিবেশনে এবং তাঁর লেখার মাধ্যমে সাম্প্রতিক বিতর্কমূলক রাজনৈতিক ঘটনা নিয়ে এবং গণজীবনের সাধারণ সমস্যা নিয়ে বহু আলোচনা করেছেন। অনেকের মতে চিন্তাবিদ হিসেবে মিলের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ আছে। তবুও বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ মানুষের জীবন-দর্শনের উপর তাঁর রচনার প্রভাবকে কারলাইল (Carlyle) এবং রাসকিনের (Ruskin) প্রভাবের সাথে তুলনা করলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ইংরেজ জনগণের উপর তাঁর চিন্তাধারা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। আজ এক শতাব্দীর অধিক কাল অতিক্রম হয়ে যাওয়ার পরও মানুষের নৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন সেই প্রভাব থেকে মুক্ত হয় নি বা তাঁর রচনা নিয়ে আলোচনাও স্তিমিত হয়ে যায় নি। উল্লেখ্য যে, তাঁর প্রভাব কেবলমাত্র ব্রিটেনেই সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র ব্রিটিশ উপনিবেশের বুদ্ধিজীবীরাই মিলের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হন। এইভাবে মিলের উদারপন্থী রাজনৈতিক মতবাদ পৃথিবীর বুক থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটানোর ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জন স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাব সামাজিক, নৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার উপর প্রধানভাবে লক্ষণীয়। তাঁর লেখনীর মাধ্যমে উদারপন্থী চিন্তাধারা নবজীবনে সিঞ্চিত হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভিক্টোরিয়ান চিন্তা জগতের আবদ্ধতার মাঝে আলোড়নের সৃষ্টি করে এক বিপ্লবের সূচনা করে। মিল অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে দার্শনিক-সুলভ যুক্তিতর্কের মাধ্যমে নৈতিক, সামাজিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে তাঁর উদারপন্থী বক্তব্য উপস্থাপন করেন। তিনিই প্রথম বারের মত ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নারীর ভোটাধিকারের প্রস্তাবটি আনয়ন করেন। মিলের মতে সামাজিক পরিবর্তন এবং সামাজিক স্থিতিশীলতার মৌল নির্ধারক হল আমাদের বিশ্বাস। যেখানেই আমাদের মধ্যে একটি ঐক্য-অভিমত থাকবে সেখানেই সমাজ হবে স্থিতিশীল। এই ঐক্য-অভিমতের অনুপস্থিতিতে সমাজে পরিবর্তন আসবে। এই পরিবর্তন

BanglaBook.org

সেই সমাজকে একেবারে ভেঙেও দিতে সক্ষম। একটি আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার জন্য উপযোগী ঐক্যমত গঠন করার কাজে মিল পূর্ববর্তী কোন মতবাদকেই সঠিক-ভাবে উপযুক্ত মনে করেন নি। তাই তাঁর রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এমন একটি অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপযোগবাদী ভিত খুঁজে বের করা, যার উপর নানাবিধ আংশিক সত্যকে একত্রিত করে একটি যথার্থ ঐক্যমত বা বিশ্বাসে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলা সম্ভব হবে। মিল তাঁর নিজস্ব মতবাদ গঠনে এপিক্যুরাসের নীতি-দর্শনের দ্বারাই প্রধানত প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি তাঁর আদর্শ সমাজ ব্যবস্থার মূল সূত্রটি ***Utilitarianism*** (উপযোগবাদ) নামক গ্রন্থে উপস্থাপিত করেন।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে ***Fraser's Magazine***-এ ***Utilitarianism*** তিনটি ভাগে প্রথম বারের মত প্রকাশিত হয়। পুস্তক আকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে। এই ক্ষুদ্র কলেবর কিন্তু বহুল আলোচিত গ্রন্থটিকে বাংলায় অনুবাদ করা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। মিলের এই গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সম্মান শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের জন্য অন্যতম নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তক, এবং আমার জানা মতে, বাংলাদেশের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে এই গ্রন্থটি অবশ্য-পাঠ্য গ্রন্থ হিসাবে নির্বাচিত। এই দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনা করতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। মূল অন্য ভাষার পাঠ্যপুস্তক বাংলায় অনুবাদ করার বিষয়টি এই কারণে অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এই বিবেচনায় এবং ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধে আমি কয়েক বছর আগে মিলের ***Utilitarianism*** অনুবাদ করতে আরম্ভ করি। নানাবিধ ব্যক্তিগত পারিবারিক এবং পেশাগত অসুবিধার কারণে অনুবাদ কর্মটি শেষ করতে বিলম্ব হলেও আমি ১৯৮৮ সালের মে মাসে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপিটি তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি। এইভাবে ছাত্রছাত্রীদের অনুরোধ রক্ষা করতে পেরে আমি স্বস্তি পেয়েছি বললে অত্যুক্তি হবে না।

এই গ্রন্থটিতে মিলের ভাষা প্রায় সর্বত্রই জটিলতাপূর্ণ এবং তার বক্তব্যও বহু জায়গায় দুর্বোধ্য এবং কোথাও কোথাও বড়ই অস্পষ্ট। এই দুর্বোধ্যতা ও অস্পষ্টতার জাল ভেদ করে সঠিক বক্তব্যকে সম্যক বুঝে অনুবাদের কাজটি সম্পন্ন করা অতি কষ্টকর ও জটিল। ১৯৭৮ সাল থেকে আজ পর্যন্ত এই দীর্ঘ দশ বছর ধরে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে মূল গ্রন্থটি ছাত্রছাত্রীদের সাথে আমি নিজেও নিয়মিত পাঠ করে যাচ্ছি। সেই কারণেই হয়ত এই দুরূহ কাজটি সম্পন্ন করার সিদ্ধান্তে আমি বিচলিত হই নি। এই অনুবাদ কর্মে আমি মিলের লেখার বৈশিষ্ট্য ও চংয়ের মৌলিকত্বকে যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রেখে ভাষান্তর করার চেষ্টা করেছি। এই কারণে মূল গ্রন্থের ভাষাগত

BanglaBook.org

জটিলতা সর্বক্ষেত্রে সহজতর করে তোলা সম্ভব হয় নি। আমি অকপটে স্বীকার করছি যে আমার একান্ত আন্তরিক প্রচেষ্টার পরও গ্রন্থটির অনুবাদে সম্ভবত কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি রয়ে গেছে। এই আশঙ্কায় আমি দুঃখ প্রকাশ করছি এবং আশা করছি ভবিষ্যতে সম্ভাব্য ত্রুটিগুলো সংশোধনের সুযোগ পাবো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মূল গ্রন্থের সব পাদটীকা আমি অনুবাদ গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করি নি। যে-সকল পাদটীকা আমি বাদ দিয়েছি সেইগুলো মিলের *Utilitarianism*-কে বা তাঁর দর্শনকে বুঝতে খুব সহায়ক হবে বলে আমার মনে হয় নি। তবে অনুবাদ গ্রন্থটির শেষে আমি একটি গ্রন্থপঞ্জী দিয়েছি। মিলের চিন্তাধারাকে গভীরভাবে বুঝতে হলে এই গ্রন্থপঞ্জীতে উল্লেখিত গ্রন্থগুলোর অধ্যয়ন অত্যন্ত সহায়ক হবে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের শিক্ষক ডঃ আবদুল মতীন ও জনাব সৈয়দ কমরুদ্দীন হোসেইন *Utilitarianism*-এর অনুবাদ "উপযোগবাদ"-এর খসড়া পাণ্ডুলিপির দোষত্রুটি সংশোধন করার বিষয়ে তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। বাংলা একাডেমী কর্তৃপক্ষের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতায় "উপযোগবাদ" অতি শীঘ্র প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। এই জন্য তাঁদের আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

সেপ্টেম্বর, ১৯৮৮
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা।

হাসনা বেগম

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

BanglaBook.org

## সূচী


| | | |
|---|---|---|
| প্রথম অধ্যায় | : সাধারণ মন্তব্য | ১ |
| দ্বিতীয় অধ্যায় | : উপযোগবাদ কি | ৮ |
| তৃতীয় অধ্যায় | : উপযোগ নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন | ৩১ |
| চতুর্থ অধ্যায় | : উপযোগবাদ নীতির সপক্ষে কি ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন সম্ভব | ৪৭ |
| পঞ্চম অধ্যায় | : ন্যায়নীতি ও উপযোগের সম্পর্ক | ৫৬ |
| পরিভাষা | : ইংরেজী থেকে বাংলা | ৮৭ |
| গ্রন্থপঞ্জী | | ৯১ |



The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

প্রথম অধ্যায়

# সাধারণ মন্তব্য

মানব-জ্ঞানকে বর্তমান অবস্থায় উন্নীত করে তোলার ক্ষেত্রে অথবা প্রাধান্যময় বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনাকে গুরুত্বপূর্ণভাবে পশ্চাৎপদ করে রাখা থেকে বিরত রাখার ক্ষেত্রে সহায়ক অবস্থা বাস্তবায়নের বিষয়টি যেভাবে এগিয়ে গিয়েছে নীতিসঙ্গত অথবা নীতিবিগর্হিত বিষয়ে মানদণ্ড-সম্বন্ধীয় বিরোধ নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার পক্ষে সহায়ক অবস্থা আজও পর্যন্ত এগিয়ে যায় নি। দর্শনের ঊষালগ্ন থেকেই মূলত একই বিষয়সংক্রান্ত **পরম উদ্দেশ্য** (summum bonum) অথবা নৈতিকতার ভিত্তির প্রশ্নটি অনুধ্যানমূলক গবেষণার ক্ষেত্রে প্রধান সমস্যা বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। অধিকাংশ সহজাত ধীসম্পন্ন ব্যক্তি এই সমস্যা সমাধানে নিজেদের নিয়োগ করেন, এবং তাঁরা নানা গোষ্ঠী ও চিন্তাধারায় বিভক্ত হয়ে একে অপরের সাথে প্রচণ্ডভাবে তর্ক-বিতর্কে নেমে পড়েন। তবু কিন্তু সেই যখন যুবক সক্রেটিস (Socrates) বৃদ্ধ প্রটাগোরাসের (Protagoras) বক্তব্য শুনতেন আর তথাকথিত সফিস্টদের (the Sophists) জনপ্রিয় নৈতিকতার বিরুদ্ধে উপযোগবাদী মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করতেন (যদি প্লাটোর সংলাপটি[১] বাস্তব আলোচনার ভিত্তিতে রচিত হয়ে থাকে), সেই তখন থেকে আজ দুই হাজার বৎসর উত্তীর্ণ হবার পরও দার্শনিকেরা একইভাবে নানা প্রকারের বিরোধী-মতাবলম্বী পতাকাতলে সমবেত হয়ে আছেন। এই দীর্ঘকালের বিতর্কের পরও আজ পর্যন্ত এই বিষয়বস্তুটি আলোচনা করতে গিয়ে চিন্তাবিদরা অথবা সমগ্র মানবজাতি মতৈক্যের বিন্দুমাত্র নৈকট্যে পৌঁছতেও সক্ষম হয় নি।

এই একই ধরনের বিভ্রান্তি এবং অনিশ্চয়তা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে একই ধরনের মতবিরোধ বিজ্ঞানের সকল শাখা সম্বন্ধীয় মূলনীতিগুলো নিয়েও যে বিদ্যমান রয়েছে তা সত্য। এমন কি এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিত বিষয়

---

১. লেখক সম্ভবত প্লাটোর অন্যতম সংলাপগ্রন্থ ***Protagoras***-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। — অনুবাদক।

BanglaBook.org

বলে গণ্য যে গণিতবিদ্যা সেটা পর্যন্ত এই অবস্থার বহির্ভূত নয়। তবে ঐ সকল বিজ্ঞান ও বিদ্যার সিদ্ধান্তের বিশ্বাসযোগ্যতাকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত না করেই, এবং প্রায়শ বস্তুতই বিন্দুমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত না করেই কিন্তু সেগুলো বিদ্যমান রয়েছে। এটা এমন একটি সুস্পষ্ট ব্যত্যয় যাকে ব্যাখ্যা করতে হলে বলতে হয়, যেগুলোকে মূলনীতি বলা হয় সেগুলো থেকে বিজ্ঞানের বিশদ বিশদ মতবাদ সাধারণত অনুমান করা হয় না, অথবা নিজেদেরকে প্রমাণ করার জন্যও সেই মতবাদগুলো ঐ সকল মূলনীতির উপর নির্ভরশীল নয়। যদি তেমন না হত তবে বীজগণিত অপেক্ষা অধিকতর অনিশ্চিত অথবা যে-বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত যুক্তির দিক দিয়ে অধিকতর অসন্তোষজনক তেমন কোন বিজ্ঞানের উৎপত্তি ঘটতো না।—এই বিজ্ঞানের নিশ্চয়তার বিন্দুমাত্র অংশও সাধারণত শিক্ষার্থীদের এই বিজ্ঞানের উপাদান বলে যা শিক্ষা দেয়া হয় তার থেকে উদ্ভূত হয় না। কারণ এই বিজ্ঞানে পারদর্শী তেমন অতি প্রখ্যাত শিক্ষকদের দ্বারা প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও সেগুলো ইংরেজ আইনের মতনই কল্প-কাহিনী নিয়ে বা ধর্মতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত রহস্যময় কাহিনীর মত বিষয় নিয়েই পরিপূর্ণ। কোন একটি বিজ্ঞানের মূলনীতি বলে যে-সকল সত্যকে সর্বশেষে গ্রহণ করা হয়ে থাকে সেগুলো যথার্থ অর্থে আধিবিদ্যক বিশ্লেষণের শেষ ফলাফল মাত্র। এই সকল বিশ্লেষণ ব্যবহৃত হয় বিজ্ঞানের বহু আলোচিত মৌলিক ধারণাবলী ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে। বিজ্ঞানের সাথে সেগুলোর সম্বন্ধ একটি অট্টালিকার সাথে তার ভিতের সম্বন্ধের মত নয়। বরং এই সম্বন্ধ একটি বৃক্ষের সাথে তার শিকড়ের সম্বন্ধের মত, যদিও এখানে শিকড়গুলো মাটিতে গ্রথিত না হয়ে আলোর দিকেই প্রসারিত হয়ে আছে। যদিও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট বিশেষ সত্যগুলো সাধিক মতবাদের পূর্ববর্তী, তবু এর বিপরীতই ব্যবহারিক বিদ্যার ক্ষেত্রে ঘটে বলে মনে হয়—অন্তত ঘটে নৈতিকতা অথবা আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে। সকল কার্য-কলাপই কোন-না-কোন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যই সম্পাদিত হয়, এবং কাজের নিয়ম সম্বন্ধে এমন ভেবে নেয়াই স্বাভাবিক যে বিশেষ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের সহায়ক হিসেবেই সেগুলো নিজস্ব সামগ্রিক চারিত্র এবং স্বরূপ অর্জন করেছে। আমরা যখন কোন উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত হই তখন প্রথমেই আমাদের মনে যা সাধনা করতে চাচ্ছি সেটার সুস্পষ্ট এবং যথাযথ ধারণা থাকতে হবে, নিয়োজিত হবার পরবর্তী পদক্ষেপে তা থাকলে হবে না।

এমন মনে করা যেতে পারে যে, নীতিসঙ্গতের ও নীতিবিগর্হিতের অভীক্ষা কি নীতিসঙ্গত বা নীতিবিগর্হিত তা নির্ধারণের মাধ্যম; এবং এই অভীক্ষা কি

BanglaBook.org

নীতিসঙ্গত ও কি নীতিবিগর্হিত পূর্বনির্ধারিত সেই তথ্যের একটি অনুবর্তী কিছু নয়।

একটি প্রকৃতিগত মানসিক শক্তি বা কোন একটি স্বাভাবিক প্রবণতা যে আমাদের নীতিসঙ্গত অথবা নীতিবিগর্হিত সম্বন্ধে জ্ঞাত করে এই জন্যই যে মতবাদের শরণাপন্ন হয়ে এই সমস্যাকে এড়ানো সম্ভব নয়। কারণ—এই ধরনের সহজাত নৈতিক প্রবণতার অস্তিত্বশীলতার প্রশ্নটি যে বিতর্কমূলক সে-তথ্য ছাড়াও যে-ব্যক্তিরা এই মতে বিশ্বাসী এবং দর্শনের প্রতি অনুরক্ত বলে ভান করেন, তাঁরাও কিন্তু এই ধরনের মানসিক শক্তি বিশেষ ক্ষেত্রে কোন্‌টি নীতিসঙ্গত আর কোন্‌টি নীতিবিগর্হিত তা নির্ধারণে যে তেমনভাবে সক্ষম, যেমনভাবে আমাদের অন্যান্য ইন্দ্রিয়শক্তি যথার্থভাবেই দৃশ্য বা ধ্বনি সম্বন্ধে আমাদেরকে জ্ঞাত করাতে সক্ষম, এই ধারণাকে বর্জন করতে বাধ্য হয়েছেন। যাঁদেরকে চিন্তাবিদ বলে মনে করা হয় সেই সকল নৈতিক মানসিক শক্তিতে বিশ্বাসী ভাষ্যকারদের মতে এই শক্তি শুধুমাত্র আমাদের নৈতিক বিচারের নীতিমালাই পরিবেশন করে থাকে। তাঁদের মতে, এই শক্তি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিরই একটি শাখা এবং সেটা আমাদের সংবেদন শক্তির কোন শাখা নয়। তাঁরা বলেন যে এই শক্তির সাহায্য গ্রহণ কেবলমাত্র নৈতিকতার বিমূর্ত মতবাদ প্রণয়নের ক্ষেত্রেই যথোপযুক্ত হবে, বাস্তব পরিস্থিতিতে নৈতিকতাকে প্রত্যক্ষণ করার ক্ষেত্রে নয়। তবে নীতিবিদ্যায় স্বজ্ঞাবাদী (Intuitive) গোষ্ঠী সাধিক নিয়মের উপর যেমন গুরুত্ব আরোপ করে, আরোহ বাদী (inductive) নামে আখ্যায়িত গোষ্ঠীও সেই তুলনায় এর উপর কম মাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে না। একটি বিশেষ কাজের নৈতিকতা যে কোন প্রত্যক্ষ প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু নয়, বরং একটি নিয়মকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার প্রশ্নই এর সাথে জড়িত, এই ব্যাপারে উভয় দার্শনিক গোষ্ঠীই একমত পোষণ করে। একই নৈতিক নিয়মকেই হয়ত এই উভয় চিন্তা-গোষ্ঠীই স্বীকৃতি দিচ্ছে। তবে উভয়ের মধ্যে মতানৈক্য হল এই নিয়মের প্রমাণ ও উৎস সম্বন্ধীয় প্রশ্ন নিয়ে। একটির মত অনুসারে নৈতিকতার এই নীতিগুলোর প্রমাণ হল পূর্বতঃসিদ্ধ (*a priori*), কেবলমাত্র এগুলোর পরিমার্জিত অর্থ আনুধাবন ব্যতীত আর অন্য কোন কিছুই এগুলোর কর্তৃত্ব মেনে নেয়ার জন্য আবশ্যক নয়। অপর মতটি অনুসারে নীতিসঙ্গত বা নীতিবিগর্হিত বিষয়ের প্রশ্ন সত্যতা ও মিথ্যাত্ব বিচারের মতই নিরীক্ষণ এবং পরীক্ষণের প্রশ্নের সাথে জড়িত। কিন্তু উভয়ই এই বিষয়ে একমত যে নৈতিকতাকে অবশ্যই কোন নীতি থেকে উদ্ভূত হতে হবে। আরোহবাদী চিন্তা-গোষ্ঠীর মতই স্বজ্ঞাবাদী চিন্তা-গোষ্ঠীও সম-মাত্রায়ই দৃঢ়তার সাথে এই অভিমত পোষণ করে যে নৈতিকতা সম্বন্ধীয় একটি বিজ্ঞান

BanglaBook.org

আছে। তবুও কিন্তু এই গোষ্ঠীদ্বয়ের কোনটি পূর্বতঃসিদ্ধ নীতির একটি তালিকা প্রস্তুতের কাজটি সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন করার প্রচেষ্টা আলো করে নি, যে-তালিকা এই বিজ্ঞানের পূর্বানুমান (premises) হিসেবে কাজ করতে সক্ষম। কদাচিৎ আবার এই গোষ্ঠীগুলো ঐ সকল বিভিন্ন নীতিকে একটি মুখ্য নীতিতে অথবা ঔচিত্যের একটি সার্বিক ভিত্তিতে রূপান্তরিত করার প্রতি সচেষ্ট হয়েছে। সেগুলো হয় নৈতিকতার প্রচলিত কর্মবিধির **পূর্বতঃসিদ্ধ** কর্তৃত্ব আছে বলে মেনে নিচ্ছে, নয় এই নীতিগুলোর সপক্ষে সাধারণ ভিত্তি বলে এমন একটি সার্বিকীকরণ করছে বা আবার নিজেই সুস্পষ্টভাবে সেই নীতিগুলোর তুলনায় অত্যন্ত স্বল্পমাত্রায়ই কর্তৃত্ব বহন করে। আবার এই সার্বিকীকরণ কখনও সাধারণের দ্বারা গৃহীত হয় নি। তবে এই সকল ভণিতাকে মেনে নিতে হলে, হয় সকল নৈতিকতার মূলে কেবল একটি মাত্র মৌলিক নীতি বা নিয়ম থাকা উচিত হবে, নয় যদি একাধিক নীতি থাকে তবে সেক্ষেত্রে সেগুলোর পক্ষে অবশ্যই নিজেদের মধ্যে একটি নির্ধারিত পূর্বাপর-সম্বন্ধ বিজড়িত হয়ে প্রণালীবদ্ধ হয়ে থাকা উচিত হবে। সেই একটি মাত্র নীতি বা নানাবিধ নীতির মধ্যে যখন মতানৈক্যের কারণ ঘটবে তখন সে-সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে-নিয়মটি প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে সেটাকে অবশ্যই স্বপ্রমেয় (self-evident) হতে হবে।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এই অভাবটির যে কত সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে অথবা কোন একটি সুস্পষ্ট পরম মানদণ্ড অনুধাবনের অনুপস্থিতি যে মানব জাতির নৈতিক বিশ্বাসের ক্ষেত্রকে কি পরিমাণে দূষিত করেছে বা অনিশ্চিত করে তুলেছে সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে হলে একটি সম্পূর্ণ জরিপ কার্য পরিচালনা করা এবং অতীত ও বর্তমানের সকল নৈতিক মতবাদের সমালোচনা করা আবশ্যক। সে যাই হোক, এই সকল নৈতিক বিশ্বাস যে পরিমাণেই স্থিরতা বা সঙ্গতি সাধনে সক্ষম হোক-না-কেন কেবলমাত্র মানদণ্ড বা আদর্শকে অনুধাবন করার অক্ষমতার পরোক্ষ প্রভাবের কারণেই এমনটা হওয়া যে সম্ভব হয়েছে এই তথ্য প্রদর্শন করা অতি সহজ। যদিও মুখ্য নীতিটি অনুধাবনে অকৃতকার্যতার কারণে মানুষের বাস্তব আবেগকে পবিত্র করে রাখার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসেবে নীতিবিদ্যা আশানুরূপ কার্যকরী হতে সক্ষম হয় নি, তবু কিন্তু নানা প্রকার জিনিসই যে মানুষের আনন্দের (happiness)[২] উপর

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ের অষ্টম থেকে দশম পরিচ্ছেদে 'আনন্দ' বলতে কি বুঝায় তা বলা আছে। মিল 'happiness' ও 'pleasure' এই দুইটি শব্দই ব্যবহার করেন। তাঁর দ্বারা শব্দ দুইটি কদাচিৎই সমার্থকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বলে আমি মনে করি। আমার মতে happiness বলতে সাধারণভাবে সুখের (pleasure) চেয়ে অধিক কিছু বোঝানো হয়েছে, যেমন প্রশান্তি, সুখপূর্ণতা, সন্তুষ্টি ও সূক্ষ্ম মানসিকবোধ প্রভৃতির সম্মেলনে একটি অনন্য অবস্থা। বাংলায় এই শব্দটির যথাযথ পরিভাষা আছে বলে আমার জানা নাই। এখানে আমি 'আনন্দ' শব্দটি ব্যবহার করছি।—অনুবাদক

ফলাফল উৎপাদন করে, এই তথ্য দ্বারা মানুষের শুভেচ্ছামূলক অথবা বিরোধমূলক এই উভয় আবেগই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে প্রভাবিত হচ্ছে। উপযোগ নীতির অথবা পরবর্তীকালে বেনথাম (Bentham) যে-নীতিকে অধিকতম আনন্দ নীতি (the greatest happiness principle) বলে অভিহিত করেন সেই নীতির এমন সকল ব্যক্তির মনেও নৈতিক অভিমত গড়ে তোলার বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে যারা এই নীতির কর্তৃত্বকে অত্যন্ত ঘৃণার সাথে প্রত্যাখ্যান করে। এমন কোন চিন্তা-গোষ্ঠী নেই যে-গোষ্ঠী আনন্দের উপর কার্য-কলাপের প্রভাবই যে নৈতিকতার বহু বিশদ বিশদ ক্ষেত্রে সর্বাধিক বাস্তব এবং এমন কি প্রভাবসম্পন্ন বিবেচনা হয়ে দাঁড়ায় এই তথ্য মেনে নিতে অস্বীকার করে। সেই গোষ্ঠী যত অধিক মাত্রায়ই এই নীতিকে নৈতিকতার মৌলিক নীতি বলে এবং নৈতিক কর্তব্যবোধের উৎস বলে মেনে নিতে অসম্মত হোক-না-কেন, এই তথ্যটিকে মেনে নিতে সেটা বাধ্য হয়। আমি অধিকতর সাহসের সাথে এমনও বলতে চাই যে, পূর্বতঃসিদ্ধ নৈতিকতায় বিশ্বাসী এবং তর্ক-বিতর্কে নেমে পড়তে সদা প্রস্তুত তেমন সকল নীতিবিদের নিকটও উপযোগবাদী মতবাদটি অপরিহার্য। এখানে ঐ সকল নীতিবিদের সমালোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে দৃষ্টান্তস্বরূপ আমি এখানে এঁদের মধ্যে সর্বাধিক প্রখ্যাত নীতিবিদ ক্যান্টের (Kant) দ্বারা প্রণীত **দ্য মেটাফিজিকস অব এথিক্স** (*The Metapnysics of Ethics*) গ্রন্থটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ না করে পারছি না। এই অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, যাঁর চিন্তা-কাঠামো দার্শনিক চিন্তাধারার ইতিহাসে বহুকালের জন্য পথ-নির্দেশক হয়ে থাকবে, তার উপরোক্ত রচনায় নৈতিক কর্তব্যবোধের উৎস এবং ভিত্তিস্বরূপ একটি সার্বজনীন নীতি প্রণয়ন করেছেন। নীতিটি হল: "এইভাবে কার্য সম্পাদন করতে হবে যেন যে-নিয়ম অনুসরণে তুমি কার্যটি সম্পাদন করবে তা সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তার জন্য (rational beings) নিয়ম বলে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।" কিন্তু ক্যান্ট এই নীতি থেকে বাস্তব ক্ষেত্রে নৈতিক কর্তব্য কি হবে তা নির্ধারণের চেষ্টা করতে গিয়ে সর্বাপেক্ষা দারুণভাবে এবং অবিশ্বাস্যযোগ্য রূপেই অনৈতিক আচরণবিধির পক্ষে সকল বুদ্ধিবৃত্তিক সত্তা দ্বারা গৃহীত হওয়ার ব্যাপারটায় যে কোন অসঙ্গতি বা যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা রয়েছে (প্রাকৃতিক দিকটি যদি বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা নাও হয়) সেই তথ্য প্রদর্শনে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি যা প্রদর্শনে সক্ষম হয়েছেন তা শুধুমাত্র এই: [অনৈতিক আচরণ] মানবিকভাবে গৃহীত হবার পরিণাম এমন হবে যা কোন ব্যক্তি বাস্তবায়ন করতে ইচ্ছুক হবে না।

এখনকার মত অন্যান্য মতবাদ নিয়ে আর অতিরিক্ত আলোচনা না করে আমি "উপযোগবাদী" অথবা "আনন্দ" মতবাদকে অনুধাবন করতে এবং এই মতবাদের

BanglaBook.org

গুণাগুণ বা মর্ম উপলব্ধির ক্ষেত্রে কিছু অবদান রাখতে চেষ্টা করব, এবং এই মতবাদের সপক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ উপস্থাপনের চেষ্টা করব। এটা সুস্পষ্ট যে প্রমাণ পদটি সাধারণ এবং সর্বজনগ্রাহ্য অর্থে যা বোঝায় সে-সম্বন্ধে এখানে বলা হচ্ছে না। কোন কিছুকে ভাল বলে প্রমাণ করতে হলে সেটা তখনই ভাল বলে প্রমাণিত হবে যখন সেটা আবশ্যিকভাবে বা কিছু কোন প্রমাণ ব্যতীতই ভাল বলে গৃহীত হয় তেমন কিছুকে বাস্তবায়নের মাধ্যম বলে ব্যবহৃত হয়। চিকিৎসা বিজ্ঞান যে ভাল তা প্রমাণ করা সম্ভব সেটা স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে উপযোগী সে-তথ্য প্রদর্শনের দ্বারা। কিন্তু স্বাস্থ্য যে ভাল তা কি উপায়ে প্রমাণ করা সম্ভব? সঙ্গীতবিদ্যা যে ভাল তার সপক্ষে যুক্তির মধ্যে অন্যতম একটি হল এই বিদ্যা সুখ উৎপাদন করতে সক্ষম। কিন্তু সুখ যে ভাল সে তথ্যের সপক্ষে প্রমাণ প্রদর্শন কি সম্ভব? তাহলে দেখা যাচ্ছে, এমন একটি ব্যাপক সূত্র রয়েছে যা যে-সকল জিনিস স্বগুণেই ভাল সেগুলোকেই অন্তর্ভুক্ত করে, এবং যা কিছু ভাল জিনিস রয়েছে তা উদ্দেশ্য রূপে ভাল না হয়ে বরং মাধ্যম রূপেই ভাল এমন দাবী করলেও কিন্তু এই সূত্রটি প্রমাণ বলতে সাধারণ অর্থে যা বোঝায় মোটেও তা নয়। যাই হোক, এই সূত্রটিকে গ্রহণ করা বা বর্জন করা যে আমাদের অন্ধ আবেগ অথবা স্বেচ্ছাচারী পছন্দের উপর নির্ভরশীল নয় তেমন অনুমান অবশ্যই আমরা করতে পারি। "প্রমাণ" শব্দটিরও একটি ব্যাপকতর অর্থে আছে, এবং এই প্রশ্নটিও দর্শনের অন্যান্য বিতর্কিত প্রশ্নের মতই এই ব্যাপকতর অর্থের সাথে সম্পৃক্ত অসুবিধাগুলোকে মেনে নিতে বাধ্য। এই বিষয়টিও বীশক্তি দ্বারা অনুধাবনযোগ্য বিষয়েরই অন্তর্ভুক্ত; এবং সঠিক পথ ধরেই যে এই শক্তি এই বিষয়টিকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করে তাও কিন্তু নয়। বিচার বিবেচনা উপস্থাপনের মাধ্যমে আমাদের বীশক্তি এই মতবাদকে সমর্থন করা বা না করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম; এবং এমনটিই প্রমাণের সমতুল্য হতে পারে।

এইবার আমরা এই বিচার বিবেচনার প্রকৃতি নিয়ে পরীক্ষা করে দেখব। আমরা দেখব কিভাবে এই বিবেচনা একেত্রে প্রয়োজ্য এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে উপযোগবাদী সূত্রটি গ্রহণ বা বর্জনের কি ধরনের যৌক্তিক ভিত্তি দেয়া সম্ভব। কিন্তু এই যুক্তিভিত্তিক গ্রহণ ও বর্জনের সর্বপ্রথম শর্তই হল এই সূত্রটিকে সঠিকভাবে বুঝে নেয়া। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, সাধারণত এই সূত্রটিকে নিয়ে সম্পূর্ণ একটি ত্রুটিপূর্ণ ধারণাই সূত্রটি গ্রহণের পথে প্রধান অন্তরায়; এবং এই সূত্রটি থেকে শুধুমাত্র এই স্থূল ভ্রান্তিকে দূরীভূত করা সম্ভব হলেই ব্যাপারটি সহজ হয়ে পড়বে এবং এই গ্রহণের পথে বাধাবিপত্তিগুলো বহুলাংশে অপসারিত

BanglaBook.org

হয়ে যাবে। সুতরাং উপযোগবাদী আদর্শের প্রতি সমর্থন প্রদর্শনের জন্য প্রয়োজনীয় দার্শনিক ভিত্তি নিয়ে আলোচনা শুরু করার পূর্বেই এই মতবাদের স্বরূপকে সুস্পষ্ট করে তোলার উদ্দেশ্যে আমি মতবাদটিরই কিছু ব্যাখ্যা প্রদানে সচেষ্ট হব। এই মতবাদটি যথার্থই কিরূপে এটা যা নয় তার থেকে ভিন্নধর্মী তা প্রদর্শন করব, এবং এর বিরুদ্ধে বাস্তব আপত্তিগুলোকে খণ্ডন করব, যে-সকল আপত্তি মতবাদটির অর্ন্তগত বিভ্রান্তিমূলক ব্যাখ্যা থেকে উদ্ভূত অথবা এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত। এইভাবে আমার নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নেয়ার পর এই মতবাদটি যে অন্যতম দার্শনিক মতবাদ বলে বিবেচিত হওয়ার উপযুক্ত সেই প্রশ্নটির উপর আলোকপাত করতে সচেষ্ট হব।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

## দ্বিতীয় অধ্যায়

# উপযোগবাদ কি

প্রথমেই নীতিসঙ্গত এবং নীতিবিগর্হিতের অভীক্ষা যে উপযোগ এই মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিরা উপযোগ পদটিকে যে একটি সীমিত এবং কেবলমাত্র বাচনিক অর্থে ব্যবহার করেন, যে-অর্থে উপযোগ সুখের বিপরীত বলে গণ্য হয়, এই অজ্ঞতাপ্রসূত বিভ্রান্তিজনক ধারণা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা আবশ্যক। এই সকল উপযোগবাদ-বিরোধী দার্শনিকদের মনে মুহূর্তের জন্যও যদি এই ধরনের ভ্রান্ত ধারণার উদয় হয় তবে তাদের ক্ষমা ভিক্ষা করা উচিত হবে। উপযোগবাদ সুখের প্রতিই সকল কিছুকে নির্দেশ করে থাকে, এই সম্পূর্ণ একটি বিপরীতধর্মী অনুযোগটিকে, যে-অনুযোগ অধিকতর অপ্রাসঙ্গিক, সম্পূর্ণ স্থূলতম আকারে উপযোগবাদের বিরুদ্ধে অপর একটি অতি সাধারণ অভিযোগ হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়। একজন প্রখ্যাত লেখক এই মর্মে মন্তব্য করেছেন যে, এই একই শ্রেণীর ব্যক্তিরা বা প্রায়শ সেই একই ব্যক্তি আবার এই মতবাদকে এই বলে প্রত্যাখান করেন, "উপযোগ' শব্দটি 'সুখ' শব্দের পূর্ববর্তী হয়ে পড়লে একেবারে অব্যবহার্য রূপেই শুষ্ক হয়ে পড়ে, আর 'সুখ' শব্দটি যদি 'উপযোগ' শব্দের পূর্ববর্তী হয় তবে আবার অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ব্যবহারিক দিক দিয়ে ইন্দ্রিয়পরায়ণ হয়ে পড়ে।" যাঁদের এই মতবাদ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে তাঁরা জানেন এপিকুরাস (Epicurus) থেকে বেনথাম (Bentham) পর্যন্ত সকল লেখকই উপযোগ সূত্রটি দ্বারা এই মতই বুঝিয়েছেন যে উপযোগ সুখের বিপরীতধর্মী কিছু তো নয়ই, বরং উপযোগ বলতে সুখকেই বোঝায়, যে-সুখ বেদনার অনুপস্থিতির সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। বরং তাঁরা সর্বদাই এমনটাই ঘোষণা করেছেন যে, উপযোগিতা অন্যান্য কিছুর সাথে গ্রহণযোগ্য ও আলঙ্কারিক কিছুকেই বোঝায়, এর বিপরীত কিছুকে বোঝায় না। তবু দেখা যায় সাধারণ মানুষ এবং লেখকদের মধ্যে যাঁরা অতি সাধারণ তাঁরাও শুধুমাত্র খবরের কাগজ বা পত্রিকায় নয় এমন কি তথাকথিত গুরুগম্ভীর গ্রন্থাদিতেও সর্বদাই এই ধরনের হাল্কা ও ভ্রান্ত ধারণা উপস্থাপিত করেছেন। "উপযোগবাদী" শব্দটি দ্বারা আকর্ষিত হয়ে কেবলমাত্র শব্দটি কেমন শোনাচ্ছে সেটা জেনেই এবং শব্দটির যথার্থ অর্থটিকে অনুধাবন না করেই, তাঁরা অভ্যাসবশত এই শব্দটি ব্যবহার করে কোন কোন শ্রেণীর সুখকে প্রত্যাখান করেছেন বা গুরুত্ব প্রদান করেন নি: তাঁরা

BanglaBook.org

এইভাবে সৌন্দর্য অবলোকনের সুখকে, অলঙ্কার পরিধানের সুখকে অথবা মজা করার সুখকে প্রত্যাখ্যান করেছেন বা গুরুত্ব দেন নি। এইভাবে এই পদটিকে যে শুধুমাত্র অজ্ঞতাহেতু অবজ্ঞার সাথে অপপ্রয়োগ করা হয়েছে তা নয়, বরং কখনও কখনও আবার হালকা মনোভাব নিয়ে পদটি যে মুহূর্তের সুখের চেয়ে উন্নত মানের কিছুকে বোঝায় এই বলে সৌজন্য প্রকাশ করাও হয়েছে। এই শব্দটির একমাত্র এই বিকৃত অর্থের সাথেই সাধারণভাবে সকলে পরিচিত, এবং বর্তমানের নতুন প্রজন্ম এইভাবে শব্দটির বিকৃত ধারণাকেই এর একমাত্র ধারণা বলে গ্রহণ করেছে। যাঁরা অতীতে এই শব্দটিকে পরিচিত করেছেন এবং বহু বৎসর যাবৎ বিশিষ্ট অর্থ সহকারে ব্যবহার করা থেকে বিরত ছিলেন, তাঁদের পক্ষে এখন শব্দটিকে পুনর্ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে; তবে শব্দটিকে যে তাঁরা পুনর্ব্যবহার দ্বারা চূড়ান্ত মর্যাদাহারা অবস্থা থেকে উদ্ধার করতে পারবেন তেমন আশা তাঁদের মনে থাকতে হবে।[১]

যে-মতবাদ "উপযোগিতা" অথবা "অধিকতম আনন্দ নীতি"-কে নৈতিকতার ভিত্তি বলে গ্রহণ করে নেয়, সেটা এই অভিমত পোষণ করে যে কোন কার্য নীতিসঙ্গত হবে সেই পরিমাণে যে পরিমাণের আনন্দ সে কার্য বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে, এবং নীতিবিগর্হিত হবে তখনই যখন যা আনন্দের বিপরীত সেটা বাস্তবায়ন করবে। আনন্দের দ্বারা সুখের উপস্থিতি ও বেদনার অনুপস্থিতিকে বোঝায়; নিরানন্দ দ্বারা বেদনার উপস্থিতি ও সুখের অনুপস্থিতিকে বোঝায়। এই সূত্রটি দ্বারা যে-নৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করা হচ্ছে সেটাকে সুস্পষ্ট বুঝতে হলে আরো বহু বিষয়কে ব্যাখ্যা করতে হয়, বিশেষ করে ব্যাখ্যা করতে হয় বেদনা ও সুখের ধারণায় কি কি জিনিসকে সূত্রটি অন্তর্ভুক্ত করছে এবং প্রশ্নটিকে কোন্ পর্যন্ত একটি খোলা প্রশ্ন বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। তবে এই অতিরিক্ত ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু নৈতিকতার যে মূল সূত্রটি জীবন-যাপনের সূত্রের উপর ভিত্তিশীল তার উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না — যথা, সুখ-প্রাপ্তি এবং বেদনা থেকে মুক্তিই হল উদ্দেশ্য রূপে কাম্য হওয়ার মত একমাত্র একটি অবস্থা; এবং সকল কাম্য জিনিসই (উপযোগবাদীয় বা অন্য আর যে-কোন কাঠামো অনুসারে এই জিনিসগুলো অসংখ্য হতে পারে) কাম্য হয়ে থাকে এগুলোর অন্তস্থ সুখের জন্য, নয় তো এরা সুখ বৃদ্ধি এবং বেদনা নিবারণের মাধ্যম বলেই।

---

১. এই প্রবন্ধের প্রণেতার এই বিশ্বাস করার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে যে তিনি নিজেই সেই প্রথম ব্যক্তি যিনি উপযোগবাদীয় (utilitarian) পদটিকে ব্যবহারের আনেন। তিনি শব্দটি আবিষ্কার করেন নি। মিঃ গাল্ট (Galt)-এর *Annals of the Parish* গ্রন্থে উপস্থাপিত একটি ভাসাভাসা মন্তব্য থেকে পদটি তিনি গ্রহণ করেন।

এই ধরনের জীবনযাপনের সূত্র বহু মনকে আলোড়িত করেছে, তবে অনুভূতি ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সর্বাধিক সচেতন তেমন বহু মান্য ব্যক্তিদের মনে এই সূত্রটি আবার বদ্ধমূল অপছন্দের কারণও হয়েছে। জীবনের জন্য সুখ ব্যতীত অন্য কোন উচ্চতর উদ্দেশ্য নেই (তাঁরা নিজেরা যে-ভাবে সূত্রটিকে প্রকাশ করেন) —কামনার এবং অনুসরণের বস্তু হিসেবে সুখ ব্যতীত আর কোন উত্তম এবং মহৎ কিছুই নেই এই ধারণা দ্বারা তাঁরা এমন একটি সম্পূর্ণরূপে নিকৃষ্ট এবং নীচ মানের মতবাদের সপক্ষে বলেন যে-মতবাদ শুধুমাত্র শূকরের জন্যই উপযুক্ত হতে পারে। এই মতবাদটি এই কারণেই এপিকুরাসের অনুগামীরা প্রাচীন কালেই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কখনও কখনও এই মতবাদের আধুনিক অনুসারীরাও মতবাদটির জার্মান, ফরাসী বা ইংরেজ আক্রমণকারীদের প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন করে এই মতকে একই প্রকারে তুলনার বিষয়বস্তু করে তুলেছেন।

এপিকুরীয়দের যখন আক্রমণ করা হয়েছে তখন তাঁরা উত্তরে বলেছেন যে, তাঁরা নয় বরং অভিযোগকারীই মানব প্রকৃতিকে নিম্ন মানের মনে করে হাল্কা করে ফেলেছে, কারণ তারা মনে করে যে, কেবলমাত্র যে-শ্রেণীর সুখ শূকর উপভোগ করতে সক্ষম মানুষও তা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেণীর সুখ উপভোগ করতে সক্ষম নয়। এই ধরনের অনুমান যদি যথার্থই সত্য হত তবে এই অভিযোগের প্রতিবাদ করা সম্ভব হত না এবং সেটা তেমন অবস্থায় কোন প্রকার তিরস্কার বলেও বিবেচিত হত না। কারণ যদি মানব জাতি এবং শূকরের জন্য সুখের উৎস যথার্থই এক হয়ে থাকত তবে জীবনসংক্রান্ত যেরূপ নিয়ম কানুন একটি প্রজাতির জন্য উত্তম বলে বিবেচিত হত অপরটির জন্যও সেই একই প্রকারের হত। এপিকুরীয় জীবনযাপনের সাথে জীবজন্তুর জীবনযাপনের তুলনার কাজটি যথার্থই নিম্ন মানের বলে মনে হয় এই কারণে যে একটি জন্তুর সুখ একটি মানুষের আনন্দের ধারণাকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম নয়। মানুষের এমন কিছু মানসিক বৃত্তি আছে যেগুলো যে-কোন জন্তুর জৈবিক বৃত্তির বহু উচ্চ স্তরে অবস্থান করে, এবং যখনই সেই মানসিক বৃত্তিগুলো সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা হয় তখন সেইগুলোর পরিতৃপ্তিকে তাদের উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্তীকরণ ব্যতীত তারা কোন অবস্থাকে আনন্দ বলে মেনে নিতে পারে না। বস্তুতঃপক্ষে এপিকুরীয়রা তাঁদের পরিণাম সম্বন্ধীয় পরিকল্পনাটি উপযোগবাদীয় নীতি থেকে নিয়েছেন বলেই তাঁদেরকে যে আমি নির্দোষ বলে মনে করছি তা কিন্তু মোটেও নয়। তাঁদের পক্ষে তেমনটি করতে হলে যথেষ্ট পরিমাণে বহু স্টয়েকীয় (Stoic) এবং এমন কি বহু খ্রীস্টীয় উপাদান অন্তর্ভুক্তীকরণ প্রয়োজন হবে। তবে তেমন কোন এপিকুরীয় সূত্র

BanglaBook.org

আমাদের জানা নেই যেটা বুদ্ধিগ্রাহ্য, অনুভূতিগ্রাহ্য এবং কল্পনাপ্রসূত সুখকে এবং নৈতিক আবেগকে কেবলমাত্র সংবেদনজাত সুখের চেয়ে অতি উচ্চতর মূল্য প্রদান করে না। সে যাই হোক, একথা স্বীকার করতেই হয় যে উপযোগবাদীয় লেখকরা সাধারণত দৈহিক সুখ অপেক্ষা মানসিক সুখের উপর অধিকতর প্রাধান্য আরোপ করেন, কারণ পরবর্তীটির স্থায়িত্ব, নিশ্চয়তা, স্বল্প মূল্যে প্রাপ্যতা, প্রভৃতি গুণাগুণ অধিকতর পরিমাণে রয়েছে—অর্থাৎ, এগুলোর অন্তর্নিহিত প্রকৃতির কারণে নয়, বরং পরিবেশজনক সুবিধার কারণেই তেমন মনে করা হয়। এই সকল তথ্য দ্বারাই উপযোগবাদীরা তাঁদের বক্তব্যকে সম্পূর্ণভাবে প্রমাণ করতে পারেন; তবে একই সাথে যাকে বলা যায় অধিকতর উন্নত মানের ভিত্তি তেমন কিছুকেও তারা পূর্ণ সঙ্গতির সাথেই গ্রহণ করতে পারতেন। কোন কোন প্রকারের সুখ যে অন্যান্য সুখের তুলনায় অধিকতর কাম্য ও অধিকতর মূল্যবান এই তথ্যটিকে অনুধাবন করাও উপযোগ নীতিটির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণ। অন্যান্য জিনিসকে বিচার করতে গুণগত ও পরিমাণগত এই উভয়কে বিবেচনাভুক্ত করতে হয়; এই দিক দিয়ে সুখের বিচারকে কেবলমাত্র পরিমাণের দিকটির উপরই নির্ভরশীল হতে হবে তেমন অনুমান করাটা মোটেও যুক্তিসঙ্গত নয়।

যদি আমাকে প্রশ্ন করা হয়, সুখের গুণগত পার্থক্য বলতে কি বোঝায়, অথবা কেবলমাত্র সুখ হিসেবে পরিমাণের আধিক্য ব্যতীত আর কি কি কারণে একটি সুখ থেকে আরেকটি সুখকে অধিকতর মূল্যবান বলে বলে মনে করা হয়, তাহলে কিন্তু আমার একটি মাত্র উত্তরই হবে। যদি এমন হয় যে যাঁদের দুইটি সুখ সম্বন্ধেই অভিজ্ঞতা আছে তাদের সকলেই বা তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই সেই দুটি সুখের মধ্যে একটির প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন, সেটার প্রতি এই সুস্পষ্ট পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনের জন্য কোন নৈতিক ঔচিত্যবোধের উপস্থিতি থাক-বা-না-থাক, তবে সেটাই হবে অধিকতর কাম্য সুখ। যদি দুটি সুখের মধ্যে একটি সুখ এমন হয় যে যাঁরা উভয়ের সাথে সমভাবে পরিচিত তেমন সুযোগ্য ব্যক্তিরা সেটার প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন তবে আমাদের পক্ষে সেই পক্ষপাত দেখানো উপভোগটিকেই গুণগত দিক থেকে উচ্চতর মনে করা যুক্তিসঙ্গত হবে, যেটা পরিমাণগত দিক থেকে অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও—যদিও সেটা পাওয়া অধিকতর অসন্তোষের জন্ম দিতে পারে তবুও অধিক পরিমাণের অন্য কোন সুখের জন্য সেটা বর্জিত হতে পারে না।

এখন দেখা যাচ্ছে এই তথ্যটি প্রশ্নাতীতভাবে সঠিক যে যাঁরা সকল প্রকারের সুখের সাথেই সমভাবেই পরিচিত এবং সেইগুলোকে সপ্রশংস উপলব্ধি করেছেন

ও উপভোগ করেছেন তারা সর্বদাই একই ধরনের অস্তিত্বের প্রতি অধিকতর পক্ষপাতিত্ব করেন যা উচ্চতর মানসিক শক্তির প্রকাশ ঘটায়। জীবজন্তুর সুখ সম্পূর্ণমাত্রায় উপভোগ করা সম্ভব হবে তেমন নিশ্চয়তা দেয়া হলেও কিন্তু অতি অল্পসংখ্যক মানব জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রাণীই নিম্ন স্তরের প্রাণীতে রূপান্তরিত হতে মত দেবে। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বোকাতে রূপান্তরিত হতে মত দিতে পারেন না, কোন জ্ঞানী ব্যক্তি কখনও অজ্ঞতে পরিণত হওয়ার সপক্ষে মত দিতে পারেন না, বা কোন অনুভূতিশীল এবং বিবেকবান ব্যক্তি স্বার্থপর ও স্থূল হতে পারেন না, যদি তাঁদের এই বলে আশ্বস্তও করা হয় যে বোকা, অজ্ঞ আর বদমায়েশ ব্যক্তিরাই তাদের নিজেদের ভাগ্য নিয়ে অধিকতর সন্তুষ্ট হতে পারে। তাঁদের মধ্যে তেমন অনেক কিছু আছে যা কোন বোকা, অজ্ঞ বা বদমায়েশ ব্যক্তিদের মধ্যে নাই; যা তাদের আছে তা তারা কিছুতেই খোয়াতে রাজী হবেন না—এভাবে তাদের মধ্যেও সেই সব বোকা, অজ্ঞ আর বদমায়েশদের মতো যে কামনাগুলো অবস্থান করছে সেগুলোর পূর্ণতম পরিতৃপ্তি যদি সম্ভবপর না হয় তবুও তাঁরা অটুট থাকবেন। যদি কখনও তাঁরা তেমন কিছু করবেন বলে কল্পনা মাত্র করেন সেটা করবেন কেবলমাত্র ঐ সকল ক্ষেত্রে যখন নিরানন্দের পরিমাণ এত চরমভাবে অধিক হয়ে পড়বে যে সেটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে অন্য যা কিছু একটাকে গ্রহণ করতে রাজী হতে পারেন, সেটা তাঁদের কাছে অত্যন্ত অধিক মাত্রায় কামনার অযোগ্য হলেও। উচ্চতর মানসিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে আনন্দিত হতে হলে অধিকতর প্রাপ্তি প্রয়োজন। সম্ভবত তেমন ব্যক্তি আবার নিষ্করুণ যন্ত্রণা ভোগ করতেও সক্ষম। নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে নিকৃষ্টতর ব্যক্তির তুলনায় তেমন ব্যক্তির জন্য বহু ক্ষেত্রেই এই যন্ত্রণাভোগ অত্যন্ত সাধারণ হয়ে থাকে। তবু নানা প্রকারের বহু অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও তেমন ব্যক্তি কখনও যথার্থ অর্থে যে-অস্তিত্বের স্তরকে তিনি নিম্নমানের মনে করেন তাতে নিমজ্জিত হতে সম্মত হবেন না। এই অসম্মতির কারণ হিসেবে আমরা বহু কিছুকেই উপস্থাপিত করতে পারি। অহঙ্কারের কারণে এমনটা ঘটে থাকে এমনও বলতে পারি; এবং অহঙ্কার শব্দটিকে মানব জাতি দ্বারা উপভোগযোগ্য অনুভূতিগুলোর মধ্যে কিছু কিছু সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম মূল্যে মূল্যবান এবং কিছু কিছু সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্যে মূল্যবান অনুভূতির মধ্যে কোন পার্থক্য বিচার না করেই উভয়কে বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। এইঅসম্মতির কারণ হিসেবে আবার স্বাধীনতাকে অথবা ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতি অনুরাগকেও আমরা গণ্য করতে পারি; এবং স্টোয়েকবাদী দার্শনিকগণ এই অসম্মতির সপক্ষে এই বক্তব্য উপস্থাপন করেই বারবার আবেদন করেছেন। আবার ক্ষমতার প্রতি অনুরাগ

BanglaBook.org

অথবা উত্তেজনার প্রতি অনুরাগকেও যথার্থই এই অসন্তুষ্টির কারণগুলোর অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে এবং এগুলো যথার্থই এই অসন্তুষ্ট হওয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। কিন্তু যেটা এই অসন্তুষ্টির সর্বাপেক্ষা প্রধান কারণ সেটার যথাযথ পদবী হল মর্যাদাবোধ (sense of dignity); এই মর্যাদাবোধ মানব জাতির সকলের মধ্যেই কোন-না-কোন মাত্রায় অবস্থান করছে এবং তাদের উচ্চতর মানসিক শক্তির সাথে আনুপাতিকভাবে অবস্থান করছে, যদিও সেই আনুপাতিকতা সর্বদা একই রূপ না হতে পারে। মর্যাদাবোধ মানুষের আনন্দের একটি অত্যাবশ্যক অংশ বিশেষ এবং তাদের মধ্যে এই বিশ্বাসটি অতি প্রবল যে এই মর্যাদাবোধের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে তেমন কোন কিছু মানুষের জন্য কাম্য হলে তা কেবলমাত্র মুহূর্তের জন্যই কাম্য হতে পারে। এই যে পক্ষপাতিত্ব এটা কেবলমাত্র আনন্দকে বলি দান করার পরিবর্তেই সম্ভব বলে যাঁরা মনে করেন—অর্থাৎ যাঁরা মনে করেন যে একই প্রকারের পরিবেশে কোন উচ্চতর সত্তা কোন নিম্নতর সত্তার চেয়ে অধিকতর আনন্দিত হতে পারে না—তাঁরা আনন্দ ও সন্তোষ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভিন্নতর দুটি ধারণা পোষণ করেন। এমন মনে করা মোটেও বিতর্কমূলক নয় যে যে-সত্তার উপভোগ ক্ষমতা নিম্নমানের তার পক্ষে সহজেই পূর্ণমাত্রায় সন্তুষ্টি অর্জন সম্ভব, এবং যে-সত্তার উপভোগ ক্ষমতা অত্যন্ত উচ্চমানের সে সর্বদাই অনুভব করবে সে খুঁজে বেড়াচ্ছে যে-আনন্দ তেমন আনন্দ এই পৃথিবী যেমন আছে তাতে সর্বদাই ত্রুটিপূর্ণই থাকবে। তবে তাদের পক্ষে জীবনের এই অপূর্ণতাকে মেনে নিতেই হবে যদি সেটা মেনে নেয়ার মত হয়; এবং এই অপূর্ণতা সম্বন্ধে সচেতন নয় তেমন সত্তাকে হিংসা করার মত কোন কারণও তাদের জন্য থাকবে না, কিন্তু তেমনটি ঘটা সম্ভব তখনই যখন এই অপূর্ণতা যে ধরনের শুভের প্রতি ইঙ্গিত দেয় সেই ধরনের শুভের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র দুর্বলতাও থাকবে না। একটি সন্তুষ্ট শূকর হওয়ার চেয়ে একজন অসন্তুষ্ট মানুষ হওয়া উত্তম; একজন সন্তুষ্ট নির্বোধ ব্যক্তি হওয়ার চেয়ে অসন্তুষ্ট সক্রেটিস (Socrates) হওয়া উত্তম। যদি কোন নির্বোধ ব্যক্তি অথবা কোন শূকর এর বিপরীত অভিমত পোষণ করে তবে তা সে করবে শুধুমাত্র নিজস্ব দিকটিই সে জানে বলেই। বিপরীত মতাবলম্বীরা অবশ্যই উভয় দিক সম্বন্ধেই তুলনামূলক জ্ঞান রাখেন।

এই বলে অভিযোগ আনয়ন করা যেতে পারে যে, এমন বহু লোক রয়েছে যারা উচ্চতর সুখকে উপভোগ করতে সক্ষম, অথচ কখনও কখনও তারাই নানা প্রকারের প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উচ্চতর সুখকে বর্জন করে নিম্নতর সুখকে পছন্দ করে নিচ্ছে। তবে অত্যন্ত সঙ্গতিপূর্ণভাবে উচ্চতর সুখের অন্ত-

BanglaBook.org

নিহিত শ্রেষ্ঠত্বকে (intrinsic superiority.) মেনে নিয়েও পূর্ণাঙ্গ উপলব্ধির সাথে এই তথ্যটিকে গ্রহণ করা যায়। চারিত্রিক দুর্বলতার কারণে মানুষ প্রায়ই নিকটতর সুখকে নির্বাচন করে নেয়, যদিও সেটার মূল্য যে কম সে-তথ্য তাদের জানা আছে। এই ধরনের নির্বাচনা কেবল যে মানুষের দৈহিক ও মানসিক সুখের মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে তা কিন্তু নয়। বরং দুটি দৈহিক সুখের মধ্যে নির্বাচনের ক্ষেত্রেও তেমনটা ঘটতে পারে। স্বাস্থ্য যে অধিকতর ভাল [মূল্যবান] এ-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকেও কিন্তু কেউ কেউ স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেও ইন্দ্রিয়জাত সুখকে প্রশ্রয় দেয়। এমন অভিযোগও আনয়ন করা যেতে পারে যে, অনেকেই তারুণ্যের উদ্যম নিয়ে যা কিছু মহৎ সেইগুলোকে বাস্তবায়নে প্রণোদিত হয়, কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে তারাই আবার আলস্য আর স্বার্থপরতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। কিন্তু তবু এমন ক্ষেত্রেও আমি এই বিশ্বাস করব না যে যারা এই অতি সাধারণ একটি পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় তারা স্বাধীনভাবে উচ্চতর সুখের বর্ণনাকে বাদ দিয়ে নিম্নতর সুখের বর্ণনাকে পছন্দ করে নেয়। আমার বিশ্বাস যে যখনই তারা একটির প্রতি নিজেদের সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করে তখন তারা অন্যটিকে গ্রহণ করার জন্য অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। মহত্তর অনুভূতিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতা প্রায় সকল দিক দিয়েই একটি অতি সুকোমল চারাগাছের মত স্বভাবের; কেবল বিরুদ্ধশক্তির প্রভাবের কারণেই যে সেটা সহজেই শুকিয়ে যায় তা নয়, বরং সেটা শুধুমাত্র খাদ্যপ্রাণের অভাবেও মরে যেতে পারে। অধিকাংশ অল্পবয়সী মানুষের মধ্যেই এই মহত্তর অনুভূতিকে উপলব্ধি করার ক্ষমতাটি অত্যন্ত দ্রুত মৃত হয়ে যায়, যদি না জীবনপথে তাদের অবস্থান তাদেরকে যে-পেশার প্রতি উৎসর্গ করে বা যে-সমাজের মধ্যে নিক্ষেপ করে তা এই উচ্চতর ক্ষমতাকে কর্মক্ষম রেখে লালন করার জন্য অনুকূল হয়। মানুষ তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক রুচি (intollsctual tasto) হারাবার সাথে সাথে তাদের উচ্চতর আকাঙ্ক্ষাকেও হারিয়ে ফেলে, কারণ তখন তাদের সেই আকাঙ্ক্ষাকে প্রশ্রয় দেবার জন্য সময় বা সুযোগ কোনটিই আর থাকে না। এইভাবে তারা নিজেদেরকে ধীরে ধীরে নিম্নতর সুখের প্রতি পেশাগ্রস্ত করে ফেলে। তবে এমন অবস্থা তারা স্বেচ্ছায় পছন্দ করে নেয় না। অবস্থানের কারণে হয় তাদের পক্ষে তখন যে-গুলোকে পাওয়াই একমাত্র সম্ভবপর হয়ে পড়ে, নয় তো তারা তখন শুধুমাত্র কেবলগুলোকেই উপভোগ করতে সক্ষম হয়। এমন প্রশ্ন উত্থাপন করা যেতে পারে যে যদিও সকল যুগেই এই উভয় শ্রেণীর সুখকে সম্মিলিত করার প্রচেষ্টায় বহু ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে তবুও এই উভয় শ্রেণীর সুখ উপভোগে সমভাবে অনুভূতিধরণ

BanglaBook.org

তেমন কেউ সজ্ঞানে এবং সুচিন্তিতভাবে কখনও নিম্নতর সুখকে গ্রহণ করবে কিনা।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমি এইরূপ অনুমান করি যে দক্ষ ও যোগ্য বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোন আবেদন করা চলে না। দুটি সুখের মধ্যে কোনটি পাওয়া যোগ্যতম এই প্রশ্ন অথবা দুই প্রকারের অস্তিত্বশীলতার মধ্যে কোনটি অনুভূতির দিক থেকে অধিকতম সুন্দর, এগুলোর নৈতিক গুণাগুণকে এবং এগুলোর ফলাফলকে এই বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত না করে, এই প্রশ্ন সম্বন্ধে গ্রহণযোগ্য রায় শুধু তাঁরাই দিতে পারেন যাঁদের এই দুই ধরনের সুখ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকার গুণটি রয়েছে, অথবা যখন তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটবে তখন তাঁদের অধিকাংশের অভিমতটিকেই চূড়ান্ত বলে মেনে নিতে আমরা বাধ্য। সুখের গুণগত পার্থক্য সম্বন্ধে এই রায়কে গ্রহণ করার বিষয়ে কোন সন্দেহ করার প্রয়োজনীয়তা আরও কম; এমন কি সুখের পরিমাণ সম্বন্ধীয় প্রশ্নটি নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ নিয়ে বিবেচনার জন্যও আর অন্য কোন উপযুক্ত বিচারালয় নেই। দুইটি বেদনা বা যন্ত্রণার মধ্যে কোনটি অধিকতম তীব্র, অথবা দুইটি সুখদায়ক সংবেদনের মধ্যে কোনটি প্রবলতম এই নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার একমাত্র উপায় যাঁরা এই উভয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞ তাদের সাধারণ অনুমোদন ব্যতীত আর কি হতে পারে? বেদনা বা সুখ কোনটিই সমজাতীয় নয় (homogenous), এবং বেদনা সর্বদাই সুখের থেকে ভিন্নজাতীয় (heterogenous)। একমাত্র যারা অভিজ্ঞ তাদের অনুভূতি এবং রায় ব্যতীত আর কি উপায় থাকতে পারে যার দ্বারা বিশেষ একটি সুখ বিশেষ একটি বেদনার মূল্যে ক্রয় করার যোগ্য হবে কি না সে-সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়? সুতরাং, যেহেতু ঐ সকল অনুভূতি এবং রায় উচ্চতর মানসিক শক্তি থেকে উদ্ভূত সুখকে শ্রেণীগতভাবে (in kind) জন্তু-প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত এবং উচ্চতর মানসিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন সুখের তুলনায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য বলে ঘোষণা করে, সেহেতু সেই সকল অনুভূতি ও রায়কেই এই বিষয়ে বক্তব্য রাখার উপযুক্ত বলে বিবেচনা করতে হবে।

মানব আচরণের নির্দেশক নিয়ম (directivo rule) হিসেবে উপযোগ বা আনন্দের সম্পূর্ণ ন্যায় ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টায় এই সকল আলোচনা আমাকে করতে হচ্ছে। তবে কোনক্রমেই কিন্তু এই আলোচনা উপযোগবাদীয় আদর্শকে গ্রহণ করার পক্ষে কোন অপরিহার্য শর্ত নয়। কারণ এই আদর্শ কর্মকর্তার (agent) নিজস্ব অধিকতম আনন্দকেই শুধু অন্তর্ভুক্ত করে না, বরং সর্বমোট আনন্দের পরিমাণের অধিকতমটিকে অন্তর্ভুক্ত করে। মহৎ চরিত্রের একজন ব্যক্তি তাঁর মহত্ত্বের

BanglaBook.org

জন্যই যে সর্বদা অধিকতর আনন্দে থাকবেন সে-সম্বন্ধে সন্দেহ করার অবকাশ রয়েছে সত্যি, তবে তার মহত্ত্ব যে অন্যান্যদের আনন্দিত করে তোলে এবং এই পৃথিবী যে সাধারণভাবে তার মহত্ত্ব দ্বারা অনেক লাভবান হয় সে বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। সুতরাং, উপযোগবাদের উদ্দেশ্য তখনই কেবল বাস্তবায়িত হয়েছে বলে গণ্য করা যাবে যখন সার্বিকভাবে চারিত্রিক মহত্ত্বের অনুশীলন করা সম্ভব হবে। যদি এমনও হয় যে প্রত্যেকেই অপরের মহত্ত্ব দ্বারাই উপকৃত হচ্ছে, এবং আনন্দের ক্ষেত্রে সে নিজে সেই উপকার থেকে একেবারে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হয়ে পড়েছে তেমন অবস্থায়ও উপযোগবাদের উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে বলা যাবে। তবে এই ধরনের শেষোক্ত অযৌক্তিক অভিযোগকে খণ্ডন করাও নিষ্প্রয়োজন।

যে-নীতিটিকে উপরে ব্যাখ্যা করা হল সেই অধিকতম আনন্দ নীতি অনুসারে উদ্দেশ্যটি হল: এমন একটি অস্তিত্ব যাতে বেদনা বা যন্ত্রণা থেকে যথাসম্ভব দূরে থাকা হয় এবং উপভোগকে যথাসম্ভব আনন্দঘন করে তোলা হয়—আমাদের নিজস্ব শুভকে অথবা অন্য সকলের শুভকে বিবেচনা করার ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল জিনিসই এই উদ্দেশ্যের প্রতি নির্দেশ দ্বারাই কাম্য বলে বিবেচিত হয়। গুণগত পরীক্ষাকরণের এবং পরিমাণগত দিক থেকে এই গুণগত দিককে পরিমাপণের নিয়মটি হল সেই সকল ব্যক্তিদের দ্বারা পক্ষপাতিত্ব বোধ, যাঁরা এগুলো নিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগের মাধ্যমেই এই তুলনা করার পদ্ধতি সম্বন্ধে অবহিত হয়েছেন, এই অবহিত হওয়ার সাথে অবশ্য তাদের নিজস্ব স্ব-চেতনতা (self-consciousness) এবং স্ব-নিরীক্ষণ (self-observation) ক্ষমতাকেও অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। উপযোগবাদীয় অভিমত অনুসারে এটাই হল তবে মানব কার্যকলাপের উদ্দেশ্য, তাই এটাই অনিবার্যভাবে আবার নৈতিকতারই মানদণ্ড। এই কারণে এই মানদণ্ডকে "মানব আচরণের নিয়ম ও কর্মবিধি" এই বলে সংজ্ঞায়িত করা যায়, যে-মানদণ্ড অনুসরণ করে যে-ধরনের অস্তিত্বশীলতাকে বর্ণনা করা হয়েছে সেটাকে মানবজাতির সকলের জন্যই সর্বাধিক সম্ভাব্য ব্যাপকতরভাবে বাস্তবায়িত করা যেতে পারে। এমন কি এই বাস্তবায়ন কেবলমাত্র মানব জাতির জন্যই প্রযোজ্য নয়, অস্তিত্বশীল সকল কিছুর প্রকৃতি যে-পর্যন্ত এই বাস্তবায়নকে সম্ভবপর করে তোলে সেই সমগ্র চেতনাশীল (sentient) সৃষ্টির ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য হবে।

সে যাই হোক, এই মতবাদের বিরুদ্ধে অন্য আরেক শ্রেণীর অভিযোগকারী আছেন যারা মনে করেন যে আনন্দ সে যে প্রকারেরই হোক-না-কেন কোনদিনই

BanglaBook.org

মানব জীবন ও কার্য-কলাপের যুক্তিভিত্তিক উদ্দেশ্য হতে পারে না। কারণ, প্রথমত আনন্দ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। অত্যন্ত অবজ্ঞার সাথে তারা এমন প্রশ্ন করেন যে আমাদের আনন্দিত হবার কি অধিকার রয়েছে?—এটা এমন একটি প্রশ্ন যেটাকে মিঃ কারলাইল(Carlylo) 'কিছুক্ষণ আগে আমাদের অস্তিত্বশীল হয়ে ওঠারই (৭ bo) বা কি অধিকার ছিল?' এই প্রশ্নটি উত্থাপন দ্বারা অধিক জোরালো করে তুলেছেন। অভিযোগকারীরা আরও বলছেন যে সকল মহৎ ব্যক্তিই এমনটি মনে করেন এবং তাঁরা কখনও মহৎ হতে পারতেন না যদি তাঁরা ***Entsagen*** বা ত্যাগের শিক্ষা গ্রহণ না করতেন। তাঁরা দৃঢ়তার সাথে এমন কথাও বলেন যে এই শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা এবং সেই অনুযায়ী নিজেকে উৎসর্গ করাই হল সকল সদগুণের প্রারম্ভ এবং একটি আবশ্যকীয় শর্ত।

প্রথম অভিযোগটি বিষয়টির মূল সমস্যাকে জড়িত করতে পারে যদি সেটা যথাযথভাবে যুক্তিভিত্তিক হয়ে থাকে। কারণ যদি কোন মানুষের পক্ষে আনন্দ অনুভব করা সম্ভব না হয় তবে এই আনন্দ পাওয়া কখনও নৈতিকতার অথবা যুক্তিশীল আচরণের আদর্শ হতে পারে না। যদিও এমন ক্ষেত্রে পর্যন্ত উপযোগবাদী মতবাদের সপক্ষে আরও অধিক কিছু বলার আছে। কারণ উপযোগ কেবলমাত্র আনন্দ অন্বেষাকেই বোঝায় না, বরং এতে নিরানন্দ থেকে পরিত্রাণ এবং নিরানন্দ প্রশমনের ব্যাপারটিকেও বোঝায়। যদি পূর্বে উল্লেখিত আদর্শটি অবাস্তব হয়েও থাকে তবু কিন্তু পরবর্তীটির আরও ব্যাপকতর বিচরণ ক্ষেত্র রয়েছে এবং অধিকতর জরুরী প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে। এই ব্যাপকতর ক্ষেত্র এবং অধিকতর জরুরী প্রয়োজনীয়তা ততদিন পর্যন্ত থাকবে যতদিন পর্যন্ত মানব জাতি বেঁচে থাকাকে উপযুক্ত বলে মনে করবে, এবং নোভালিস (Novalis) দ্বারা আত্মহত্যার সপক্ষে সুপারিশ করার সপক্ষে যে-সকল শর্ত প্রদর্শিত হয়েছে তা অবলম্বন করে সকলে আত্মহত্যা করে [জীবন ধারণের বিড়ম্বনা থেকে] আত্মরক্ষা করতে ক্রমাগত সচেষ্ট হবে না।[২] সে যাই হোক, যখন এই বলে নিশ্চিত উক্তি করা হয় যে মানব জীবন আনন্দপূর্ণ হওয়া অসম্ভব, তখন এই উক্তি, যদি শুধুমাত্র কথার কথা না হয়ে থাকে, ন্যূনতম হলেও অতিশয়োক্তি তো বটেই। যদি আনন্দ বলতে অতি উচ্চমাত্রায় সুখকর অনুভূতির ক্রমশতাকে বোঝায় তবে এটা যথেষ্ট সুস্পষ্ট যে তেমনটা বাস্তবায়ন অসম্ভব। চরম সুখের অবস্থা বড় জোর কয়েকটি মুহূর্তে স্থিত হতে পারে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে, এবং কিছু কিছু বিরামের সাথে, ঘন্টার

২. Friedrich Leopold Freiherr von Hardenberg (১৭৭২—১৮০১)-এর ছদ্মনাম; জার্মান কবি এবং জার্মান রোমান্টিকতাবাদের পিতা।

পর ঘন্টা অথবা দিনের পর দিন স্থিত হতে পারে; কিন্তু তেমন অবস্থা উপভোগের বিষয়টি হঠাৎ হঠাৎ দেখা দেয়া অতি উজ্জ্বল আলোক রশ্মিই হতে পারে, কখনও চিরস্থায়ী এবং স্থিতিশীল আলো বিকিরণ করতে পারে না। যে-সকল দার্শনিক আনন্দকে জীবনের আলো বলে শিক্ষা দেন তাঁরাও যাঁরা এই কারণে তাঁদের ঠাট্টা করেন ঠিক তাঁদেরই মতন এই সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত আছেন। আনন্দ বলতে তারা যা বোঝেন সেটা তীব্র উল্লাসের জীবন (life of rapture) নয়, বরং তাঁরা এমন একটি জীবনকে বোঝেন যা বহু এবং বহুবিধ আনন্দময় মুহূর্তের সমন্বয়ে সৃষ্ট; এই জীবনে অতি অল্প সংখ্যক এবং অতি অস্থায়ী ক্ষণিক বেদনা রয়েছে এবং এই জীবনের সামগ্রিকভাবে এমন একটি ভিত্তি রয়েছে যেটার কারণে জীবন থেকে এমন কিছু আশা করা হয় না যা জীবন আমাদের দিতে অপারগ। এই ধরনের উপাদান নিয়ে যে-জীবনটি গঠিত, এবং যাঁরা এই জীবন বাস্তবায়নে সক্ষম সেই ভাগ্যবানদের জন্য, সর্বদাই সেটাই হল এমন একটা কিছু যাকে আনন্দ বলতে যা বোঝায় সে-রকম কিছু বলে বিবেচিত হবার যোগ্য বলে মনে করা যায়। এই ধরনের অস্তিত্ব নিয়ে আজও পর্যন্ত বহুলোকের পক্ষে জীবনের যথেষ্ট কাল যাপন করার সৌভাগ্য হচ্ছে। তবে প্রায় সকলের জন্যই এই ধরনের অস্তিত্ব অর্জনের পথে বর্তমান দুঃখজনক শিক্ষা ব্যবস্থা এবং দুঃখজনক সমাজ ব্যবস্থাই হল একমাত্র সত্যিকারের প্রতিবন্ধক। মানুষকে এই আনন্দকেই জীবনের আদর্শ উদ্দেশ্য বলে শিক্ষা দেয়ার পরও মানুষ যে শুধুমাত্র এই আনন্দের পরিমাণ মতো অংশ পেয়েই সন্তুষ্ট হবে সে নিয়ে অভিযোগকারীরা বোধহয় সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু মানব জাতির বহু সংখ্যক সদস্যই অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিমাণের আনন্দ পেয়েও সন্তুষ্ট থেকেছে। সন্তুষ্ট জীবনের প্রধান উপাদান মাত্র দুইটিই আছে বলে মনে হয়, এগুলোর প্রতিটিই প্রায়শ নিজের মধ্যেই এই উদ্দেশ্যের জন্য যথেষ্ট বলে প্রতীয়মান হয়: প্রশান্তি এবং উত্তেজনা। অতিরিক্ত প্রশান্তির সাথে বহু ব্যক্তি অতি স্বল্প পরিমাণের সুখ নিয়েও সন্তুষ্ট হতে পারে; আবার অতিরিক্ত উত্তেজনার সাথে বহু ব্যক্তি অতি উচ্চ মাত্রার যন্ত্রণাকেও মেনে নিতে সক্ষম হয়। এই দুটিকে একত্রিত করার ক্ষমতা যে মানব জাতির প্রধান অংশের পক্ষে সম্ভব সে-তথ্য সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবেই কোন অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি নাই। কারণ এই দুটি একটি অপরটির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তো নয়ই, বরং এগুলো স্বাভাবিকভাবেই একদলীয়—একটির বৃদ্ধি মানেই অপরটির জন্য প্রস্তুতি এবং অপরটি পাবার ইচ্ছা সৃষ্টির একটি উৎস। যাদের মধ্যে আলস্য একটি অসদগুণ হয়ে দাঁড়ায় কেবলমাত্র তারাই এই পুনর্বিকাশের জন্য বিরতির পর আবার নতুন উদ্যম অনুভব করে না। আবার যাদের মধ্যে উত্তেজনার প্রয়োজন একটি রোগের মতন হয়ে দাঁড়ায়

BanglaBook.org

কেবলমাত্র তারাই পূর্বে উল্লেখিত উত্তেজনার সাথে প্রশান্তিকে প্রত্যক্ষভাবে সমপাতিক সুখকর বলে মনে করার পরিবর্তে উত্তেজনাহীন এবং বিস্বাদ বলে মনে করে। মানুষ যখন বহির্জগতের নানা দিক দিয়ে বেশ ভাগ্যবান হওয়া সত্ত্বেও জীবনকে যথেষ্ট উপভোগ্য করে সেটাকে তাদের জন্য মূল্যবান করে তুলতে অক্ষম হয়, তখন সাধারণত অন্যদের নিয়ে কোন চিন্তা না করেই কেবলমাত্র নিজেদের কথা ভাবাই এই অক্ষমতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যাদের জনসাধারণের প্রতি অথবা নিজেদের প্রতিও কোন মমতা থাকে না তাদের মধ্যে জীবনের প্রতি উত্তেজনাও হ্রাস পায়। এমন উভয় ক্ষেত্রেই মূল্যবোধের প্রেক্ষিতে তাদের মনোভাব কেবল ক্ষয় পেতে থাকে এবং তাদের মৃত্যুর সাথে সাথে তাদের সকল প্রকার আত্ম-স্বার্থ নিঃশেষ হতে বাধ্য হয়। অন্যদিকে ব্যক্তিগত মমতাকে যারা পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় এবং বিশেষ করে যারা মানব জাতির সামগ্রিক মঙ্গলের আদর্শকে সামনে নিয়ে সহানুভূতির অনুশীলন করে, তারা মৃত্যুকে সামনে রেখেও স্বাস্থ্য ও যৌবনের উদ্যম নিয়েই জীবনের প্রতি প্রাণবন্ত উৎসাহ বজায় রাখতে পারে। স্বার্থপরতার পর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের আভীপ্সার অনুপস্থিতিই হল জীবনকে অসন্তোষজনক মনে করার আরেকটি মৌলিক কারণ। উৎকর্ষ মানসিকতা—সেটা যে কোন দার্শনিকসুলভ মানসিকতা হতে হবে তা আমি বলছি না, তবে সেটা এমন একটি মন হবে যাতে জ্ঞানের উৎসমুখটি উন্মুক্ত থাকবে এবং যেটাকে মানসিক গুণাবলীর অনুশীলন করতে কিছু মাত্রায় শিক্ষা দেয়া হবে—সেই ধরনের মানসিকতা যা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের প্রতি অশেষ আগ্রহ প্রকাশ করে: প্রাকৃতিক বস্তু চারুকলার উন্নতি, কাব্যিক কল্পনা, ঐতিহাসিক ঘটনা, অতীত ও বর্তমান মানব জাতির জীবন যাপন এবং মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা এই সকল কিছুর প্রতিই এই মানসের অসীম আগ্রহ থাকে। বস্তুতই এগুলোর হাজার ভাগের এক ভাগ সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন না করেও এগুলোর সকলগুলোর প্রতিই উদাসীন থাকা সম্ভব। কিন্তু তেমন উদাসিন্য প্রদর্শন সম্ভব কেবল যখন কোন ব্যক্তির মনে প্রাথমিক অবস্থাতেই ঐ সকল জিনিসের প্রতি কোন প্রকারের নৈতিক কিংবা মানবিক আগ্রহ অনুপস্থিত থাকে এবং কেবলমাত্র ব্যক্তিগত ঔৎসুক্যকে চরিতার্থ করতেই সে ঐ সকল জিনিসকে ব্যবহার করে।

একটি বিশেষ পরিমাণের মানসিক সংস্কৃতি ঐ সকল অনুধাবনের প্রতি একটি বুদ্ধিভিত্তিক আগ্রহ সৃষ্টি না করার জন্য যথেষ্ট না হওয়ার প্রকৃতিগত কোন কারণই থাকতে পারে না, এবং একটি সভ্য দেশের জন্ম গ্রহণ করার পর তাদের প্রত্যেকেই উত্তরাধিকারী সূত্রে এমন একটি অবস্থা না পাবার মতও প্রকৃতিগত কোন কারণ নেই। একজন মানুষকে কেন স্বার্থপরভাবে অহংভাবপূর্ণ হতে হবে তার কোন

BanglaBook.org

সামান্যতম অন্তর্নিহিত অনিবার্য কারণ নেই। একজন মানুষের পক্ষে তেমন হওয়া সম্ভব কেবল যদি সে এমন প্রকৃতির হয় যার কোন অনুভূতি নেই বা কোন প্রকারের উদ্বেগ নেই, যে-ব্যক্তি করুণভাবে শুধুমাত্র নিজস্ব ব্যক্তিসত্তা নিয়েই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে। সাম্প্রতিক বিশ্বে এই অবস্থার চেয়ে উন্নততর অবস্থা যথেষ্ট সাধারণভাবে অবস্থান করছে, এবং এই অবস্থা মানব উপজাতি কোন কোন উপাদান নিয়ে গঠিত সেই সম্বন্ধে যথেষ্ট বাস্তবিকতা প্রদর্শন করছে। খাঁটি ব্যক্তিগত অনুরাগ এবং সাধারণের মঙ্গলকে সম্ভাব্য করার প্রতি একান্ত উৎসাহ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালিত হয়েছে তেমন প্রতিটি মানব সন্তানের মধ্যে প্রদর্শিত হচ্ছে, যদিও প্রায়ই অসম মাত্রায় তেমনটি হয়ে থাকে। আমরা এমন একটি পৃথিবীতে বাস করছি যেখানে আকর্ষণ বোধ করার মতো বহু কিছু আছে, উপভোগ করার মতো বহু কিছু আছে, বহু কিছু রয়েছে যার উন্নতি সাধন করা সম্ভব এবং সংশোধন করা সম্ভব, এবং এই পৃথিবীতে যাদের সামান্য পরিমাণের নৈতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতা রয়েছে তেমন প্রতিটি ব্যক্তিই এমন অস্তিত্ব নিয়ে বাঁচতে সক্ষম, যে-প্রকারের অস্তিত্বকে ঈর্ষাযোগ্য বলা চলে। যদি কোন ব্যক্তি তার সাধ্যমতো আনন্দের উৎসকে ব্যবহার করার স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত না হয়, কোন মন্দ নীতির কারণে অথবা অন্য ব্যক্তিদের অভীপ্সার দাস হয়ে পড়ার কারণে, তবে সে এই ঈর্ষাযোগ্য অস্তিত্ব খুঁজে পেতে অসমর্থ হবে না, অবশ্য যদি সে জীবনের নিশ্চিত অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচতে পারে—যেমন, অভাব, ব্যাধি, নির্দয়তা, অযোগ্যতা অথবা ভালবাসার পাত্রকে অকালে হারানো। সুতরাং, সমস্যাটির প্রধান গুরুত্ব নির্ভরশীল এই তথ্যের উপর যে এই সকল দুর্যোগের হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে নিস্তার পেতে অত্যন্ত সৌভাগ্যবান হতে হবে। যে-অর্থে দারিদ্র্য যন্ত্রণা ও কষ্টের কারণ হয় সেই দারিদ্র্যকে সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত করা সম্ভব হতে পারে সমাজে প্রজ্ঞা এবং শুভ-বুদ্ধি ও ব্যক্তি সমগ্রের দূরদর্শিতাকে যদি একত্রিত করে কাজে লাগানো যায়। উৎকৃষ্ট শারীরিক ও নৈতিক শিক্ষা প্রদানের দ্বারা এবং বিষাক্ত অস্বাস্থ্যকর প্রভাবকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করে মানব জাতির সর্বাপেক্ষা অদম্য শত্রু রোগ-ব্যাধিকেও সম্ভবত ব্যাপকতার দিক থেকে অত্যন্ত অধিকভাবে সীমিত করা সম্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানের প্রগতি যথার্থই অদূর ভবিষ্যতে এই নিকৃষ্ট শত্রু নিধনে সমর্থ হবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে প্রতিটি পদক্ষেপই আমাদের সকল প্রিয়জনের অকালে জীবন অবসানের সম্ভাবনাকেও দূরীভূত করবে; সে-সম্ভাবনা কেবল আমাদের প্রিয়জনের জীবনের যবনিকা এনে দেয় তা নয়, বরং যা আমাদের জন্য অধিকতর বেদনার কারণ হয়। আমাদের স্থূল গুরুত্বপূর্ণ অপরিনামদর্শিতা বা কামনাকে সুনিয়ন্ত্রণ করার অক্ষমতা বা ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক

BanglaBook.org

প্রতিষ্ঠানই আমাদের ভাগ্যের বিড়ম্বনার জন্য এবং জগতের ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কিত আমাদের অন্যান্য নৈরাশ্যের জন্য প্রধানত দায়ী। সংক্ষেপে বলা যায়, সকল মানব যন্ত্রণার সর্বোচ্চ মূল উৎসগুলোই মানুষের প্রচেষ্টা এবং যন্ত্রশীলতার দ্বারা অত্যধিক মাত্রায় এবং এমন কি প্রায় সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব এবং এইভাবে বহুবিধ মানব যন্ত্রণার অবসান ঘটানো সম্ভব। যদিও এই যে অপসারণকরণ এর গতি দুঃখজনকভাবে অত্যন্ত ধীর—যদিও এই বিজয়কে সম্পূর্ণ করতে এবং এই পৃথিবীকে যন্ত্রণা থেকে সম্পূর্ণ বিমুক্ত করতে বহু প্রজন্ম ধরে এই অপসারণ কর্মটিকে চলতে হবে, এবং তেমনটি করা সম্ভব হবে যদি জ্ঞানের এবং সংকল্পের দিক থেকে আমরা পিছিয়ে না পড়ি—তবুও যত ক্ষুদ্র এবং অস্পষ্টভাবেই হোক-না-কেন প্রতিটি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং উদারমনা ব্যক্তিই এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার চেষ্টা করবেন এবং এই প্রতিযোগিতাটি থেকে এক ধরনের মহৎ উপভোগ অর্জন করতে সক্ষম হবেন; স্বার্থ চরিতার্থ করাকে প্রশ্রয় দেবার মত কোন প্রকারের উপঢৌকনই তাঁকে এই আনন্দ উপভোগ করা থেকে বিরত করতে পারবে না।

আমাদের পক্ষে আনন্দ ব্যতিরেকে জীবন যাপন শিক্ষা করা এবং সেই শিক্ষার প্রতি কর্তব্যবোধ অর্জনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আপত্তিকারীরা যে-বক্তব্য তুলে ধরেছেন, এইবার উপরোক্ত আলোচনার দ্বারাই আমাদের পক্ষে সেগুলোর যথার্থ মূল্যায়ন করা সম্ভব হবে। আনন্দ ব্যতিরেকেই যে জীবন ধারণ করা সম্ভব সে-নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় না। মানব জাতির বিশ ভাগের উনিশ ভাগ সদস্যই ইচ্ছা-প্রণোদিত না হয়েই আনন্দবিহীন জীবন যাপন করছে; এমন কি এই বর্তমান পৃথিবীর যে-সকল স্থান বর্বরতা থেকে যথাসম্ভব মুক্ত রয়েছে সেখানেও তেমনটিই ঘটছে। এও সঠিক যে, যেটাকে তাঁরা ব্যক্তিগত সুখের চেয়ে অধিক মূল্যবান মনে করেছেন তেমন উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য নেতারা এবং যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁরা ইচ্ছা-প্রণোদিত হয়েই আনন্দবিহীন জীবন যাপন করেছেন। এই যে উদ্দেশ্যটি, এটা সর্বসাধারণের আনন্দ বর্ধন অথবা এই আনন্দের কোন উপাদানকে বর্ধন করা ব্যতীত আর অন্য কি হতে পারে? কারো নিজস্ব প্রাপ্য আনন্দের অংশমাত্রকে অথবা এই আনন্দ বাস্তবায়নের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জন দেয়া নিঃসন্দেহে একটি মহৎ কাজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই যে আত্মত্যাগ এর অবশ্যই কোন বিশেষ একটি উদ্দেশ্য থাকতে হবে—এটা নিজেই নিজের উদ্দেশ্য নয়। যদি আমাকে বলা হয় যে এই উদ্দেশ্য আনন্দ নয়, এটা হল সদগুণ, যা কিনা আনন্দের চেয়েও অধিকতর উত্তম, তবে আমি প্রশ্ন করব যে যদি কোন নেতা বা শহীদ এমন বিশ্বাস না করতেন যে তাঁদের এই ধরনের আত্মবিসর্জন থেকে সর্বসাধারণের মুক্তি সাধন সম্ভব। তবে কি তাঁদের

BanglaBook.org

কেউ এইভাবে আত্মবিসর্জন দিতেন? যদি তারা ভাবতেন যে তাঁদের এই আনন্দকে পরিত্যাগ করা তাঁদের সমষ্টির জন্য কোন প্রকারের শুভ ফলাফল বাস্তবায়ন করবে না তবে কি তাঁরা এইভাবে আত্মবিসর্জন দিতেন? তাঁরা কি তেমনটা করতেন যদি তাঁরা মনে করতেন যে তাঁদের এই আত্মবিসর্জন সর্বসাধারণের জন্য ঠিক তাঁদের নিজেদের ভাগ্যে যেমন ঘটেছে তেমন ভবিষ্যতই গড়ে তুলবে এবং যারা আনন্দকে পরিত্যাগ করেছে তাদের দলেই সকলকে নিয়ে যাবে? নিজেদের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দকে অস্বীকার করে যাঁরা এই বিশ্বে আনন্দকে পরিমাণগত দিক দিয়ে বৃদ্ধি করতে যথাযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম হবেন তাঁদেরকেই আমরা সমস্ত সম্মান অর্পণ করব। কিন্তু অন্য কোন উদ্দেশ্যে কেউ যদি তা করেন বা করে থাকেন বলে ঘোষণা করেন তবে সে একটি যোগীকে তাঁর নিজস্ব স্তম্ভে বাঁধিয়ে রাখার চেয়ে অধিক এক বিন্দু প্রশংসা পাবারও যোগ্য হবে না। মানুষের পক্ষে কি করা সম্ভব সে-তথ্য সম্বন্ধে তিনি [যোগী] হয়ত বা একটি অনুপ্রাণিত করার মতই দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারেন, তবে নিশ্চিতভাবে মানুষের কি করা উচিত সে-তথ্য সম্বন্ধে তিনি কোন দৃষ্টান্ত হতে পারেন না।

এই পৃথিবীতে যে-ধরনের ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা অবস্থান করছে তার মধ্যেই শুধুমাত্র এই প্রকারে অপরের আনন্দ বৃদ্ধির জন্য চরমভাবে আত্মবিসর্জন করা কার্যকরী হতে পারে, তবে যতদিন এই পৃথিবীতে এই ধরনের ত্রুটিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে ততদিন পর্যন্তই তা সম্ভব হবে। আমি সম্পূর্ণ রূপে স্বীকার করছি যে এই প্রকারের আত্মবিসর্জনের জন্য তৈরী থাকা অবশ্যই কোন ব্যক্তির জন্য উচ্চতম মাত্রায় মূল্যবান একটি সদগুণ। আমি এই অভিমতের সাথে আরও যোগ করতে চাই যে, যদিও এই সংযুক্তিকে কূটাভাসপূর্ণ বলে মনে হতে পারে, সচেতনভাবে আনন্দকে বর্জন করে জীবন যাপন করাই হল প্রাপণীয় আনন্দকে বাস্তবায়নের সর্বাপেক্ষা সুষ্ঠু উপায়। কারণ এই সচেতনতা ব্যতীত আর কোন কিছুই কোন ব্যক্তিকে তার ভাগ্য যদি বৈরীও হয় তবুও যে সে জীবন থেকে তার যা প্রাপ্য তা থেকে বঞ্চিত হবে না, সেই আশ্বাস প্রদান করতে পারে না। এইভাবেই বিষয়টি অনুভূত হলে সেই ব্যক্তি জীবনের অশুভ সম্ভাবনা নিয়ে অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবে এবং এক প্রশান্তির সাথে আয়ত্তসাধ্য তেমন সন্তুষ্টির উৎসকে অর্জন করতে সক্ষম হবে, যেমনটি রোম সাম্রাজ্যের সর্বাপেক্ষা দুর্যোগপূর্ণ অধ্যায়ে বহু স্টোয়েকবাদী দার্শনিক অর্জন করতে পেরেছিলেন। এইভাবে সেই ব্যক্তি আয়ত্তসাধ্য সন্তুষ্টির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকবে এবং সে-অবস্থা অনিশ্চিত কাল ধরে অস্তিত্বশীল থাকতে পারে এই সম্ভাবনা নিয়ে ভাবিত হবে না, যেমন ভাবিত হবে না সেই অবস্থার নিশ্চিত অবসান নিয়ে।

BanglaBook.org

তবে ইতিমধ্যে উপযোগবাদীদের আত্মোৎসর্গের নৈতিকতাকে স্বীকার করা থেকে বিরত হবার মত কোন কারণ নেই ; কারণ এই গুণটি স্টোয়েকবাদীদের এবং অতিপ্রাকৃতবাদীদের (Transcendentalists) মতো উপযোগবাদীদের জন্যও সমভাবেই সঙ্গত বলে মনে করা চলে। উপযোগবাদী নৈতিকতা মানুষের মধ্যে নিজেদের অত্যধিক শুভকে অপরের শুভের জন্য ত্যাগ করার ক্ষমতার সঙ্গতকে অবশ্যই স্বীকার করে নেয়। এই নৈতিকতা কেবলমাত্র এই তথ্য মেনে নিতে অস্বীকার করে যে এই ত্যাগ কেবল নিজের মধ্যেই নিজে ভাল। কোন ত্যাগ যদি আনন্দের যোগফলকে বৃদ্ধি করতে না পারে অথবা সেই বৃদ্ধির প্রতি সেই ত্যাগের যদি কোন প্রবণতা না থাকে তবে এই মতবাদ এই ধরনের ত্যাগকে নিষ্ফলা বলে মনে করে। একমাত্র সেই আত্মবিসর্জনকে উপযোগবাদ উৎসাহিত করে যেটা অপরের আনন্দের প্রতি উৎসর্গিত, সেই আনন্দের কোন মাধ্যমের প্রতি উৎসর্গিত, সেই আনন্দ সামগ্রিক মানবজাতির হতে পারে অথবা ব্যক্তিবিশেষের হতে পারে যা নির্ভরশীল রয়েছে সামগ্রিক মানব জাতির স্বার্থের উপর।

আমাকে আবার বলতে হচ্ছে, উপযোগবাদ মতবাদ-অবলম্বীরা কদাচিৎই একথা ন্যায়সঙ্গতভাবে স্বীকার করেন যে আচরণের ন্যায়সঙ্গততার জন্য উপযোগবাদীয় মানদণ্ড অনুসারে কেবলমাত্র কর্মকর্তার নিজস্ব আনন্দই বিচার্য বিষয় নয়, এতে সংশ্লিষ্ট সকলের আনন্দই জড়িত রয়েছে। কর্মকর্তার নিজস্ব আনন্দ এবং অন্যের আনন্দের মধ্যে ভারসাম্য আনয়নের ব্যাপারেও একজন উপযোগবাদী কর্মকর্তাকে নিঃস্বার্থ এবং পরোপকারী দর্শকের ন্যায় অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে পক্ষপাতহীন হতে হবে। ন্যাজারাথের যীশুর সুবর্ণ-বিধান (Golden rules) পাঠে আমরা উপযোগের মূল বক্তব্য ও সম্পূর্ণ আবেগটিকে অনুধাবন করতে পারি। "তেমন কাজ কর যেমনটি তোমার প্রতি করা হবে বলে আশা কর" এবং "প্রতিবেশীকে নিজের মত ভালবাস" এই বিধিগুলো উপযোগবাদী নৈতিকতার পূর্ণাঙ্গ আদর্শকে গঠন করছে। এই আদর্শকে সর্বাপেক্ষা সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের পদ্ধতি হিসাবে উপযোগবাদ প্রথমত এমন সকল নিয়ম-কানুন ও একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে যুক্ত করে যে নিয়ম-কানুন ও ব্যবস্থার মধ্যে যথাসম্ভব প্রতিটি ব্যক্তির আনন্দ অথবা (বাস্তব দিক বিচারে এমনটিই বলা যেতে পারে) স্বার্থ সামগ্রিক স্বার্থের সাথে ঐকতানে চলতে পারে। দ্বিতীয়ত উপযোগবাদ যুক্ত করবে এমন শিক্ষা ও মতামত যা মানব চরিত্রের উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে সেই শিক্ষা ও মতামতকে এমনভাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করবে যার দ্বারা প্রতিটি ব্যক্তির মনে নিজস্ব আনন্দের সাথে সামগ্রিক আনন্দের মধ্যে একটি অটুট সুন্দর সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করা যায়, বিশেষ করে তার নিজস্ব আনন্দ এবং

BanglaBook.org

আচরণের প্রতি সার্বজনীন সম্মান প্রদর্শন করে তেমন নিজস্ব আনন্দের ও আচরণের সকল পদ্ধতিকে ইতিবাচক ও নেতিবাচক এই উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করার শিক্ষাকে যুক্ত করবে। এইভাবে ব্যক্তি বিশেষ যে নিজস্ব আনন্দের সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে চিন্তা করতে এবং সাধারণ শুভের অন্তরায় আচরণ সম্বন্ধেও চিন্তা করতে অপরাগ হয়ে উঠবে শুধু তা-ই নয়, বরং সাধারণ শুভ বা মঙ্গল হয় তেমন অভ্যাসগত প্রেষণা দ্বারা সে সর্বদাই চালিত হবে। প্রতিটি মানুষের চেতনশীল অস্তিত্বের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে এই সাধারণ শুভকে বাস্তবায়নের প্রতি আবেগগুলো স্থান জুড়ে থাকবে। যদি উপযোগবাদের অনুগামীরা উপযোগবাদী নৈতিকতাকে তাঁদের মনে এর যথার্থ বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপিত করেন, তবে আমার মনে হয় না যে যা উপযোগবাদী নৈতিকতার মধ্যে নেই তেমন সুপারিশযোগ্য কোন বৈশিষ্ট্য অন্য কোন নৈতিকতার মধ্যে আছে বলে তাঁরা বলতে পারবেন। এমনও আমার মনে হয় না যে অন্য কোন নৈতিক ব্যবস্থা অধিকতর সুন্দর ও অধিকতর উন্নত মানের মানব চরিত্রকে প্রতিপালন করার উদ্দেশ্যে তেমন কোন কাজের উৎসকে নতুন করে সুপারিশ করতে পারে যার নির্দেশে মানুষ প্রভাবিত হবে এবং যে-ধরনের কাজের উৎস উপযোগবাদী মতবাদে ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত হয় নি।

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকারীদের তারা যে সর্বদাই উপযোগবাদকে মন্দ আলোকে উপস্থাপিত করেন এই বলে দোষারোপ করা যায় না। বরং বিপরীত পক্ষে এমন হয় যে অনেকেই উপযোগবাদের নিঃস্বার্থ চরিত্রের ন্যায়সঙ্গত ধারণাটির মধ্যে এই ত্রুটির কথা উল্লেখ করেন যে এই ধরনের আদর্শ মানব জাতির জন্য অত্যন্ত উচ্চতর মানের। তাঁরা এমনও বলেন যে মানুষের নিকট এমনটি আশা করা অত্যন্ত অধিক যে তারা সর্বদাই সমাজের সর্বসাধারণের স্বার্থকে বৃদ্ধি করবে। কিন্তু এমন ধারণা এই নৈতিক মানদণ্ডের অর্থ সম্বন্ধে একটি অত্যন্ত ভ্রান্তিমূলক ধারণা এবং এর দ্বারা কাজের নিয়মের সাথে কাজের প্রেষণা বা উৎসকে এক করে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করা হয়। নীতিবিদ্যার কাজই হল আমাদের জন্য কর্তব্য নির্ধারণ করে দেওয়া, অথবা কোন্ অভীক্ষার সাহায্যে আমরা কর্তব্যকে জানতে পারবো তা বলে দেওয়া। কিন্তু কোন প্রকারের নৈতিক ব্যবস্থার জন্যই কর্তব্যবোধ আমাদের সকল কার্যকলাপের একমাত্র উৎস হতে পারে না। বরং বিপরীতভাবে বাস্তবে এমনও হয় যে আমাদের সকল কাজের শতকরা নিরানব্বই ভাগই সম্পাদিত হয় অন্যান্য প্রেষণা থেকে, এবং সেইগুলো তখনই ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হয় যখন কর্তব্যের নীতি সেগুলোকে বাতিল করে দেয় না। এই ধরনের ভ্রান্তিমূলক ধারণাকে উপযোগবাদের বিরুদ্ধে আপত্তির ভিত্তি

BanglaBook.org

রূপে ধরে নিলে যথার্থই উপযোগবাদের প্রতি অধিকতর অন্যায়ভাবে দোষারোপ করা হবে। কারণ যথার্থই উপযোগবাদী নীতিবিদরা প্রেষণা বা উদ্দেশ্য যে কোন কাজের নৈতিক উৎকর্ষ নির্ণয়ের ব্যাপারে কোন বিবেচ্য বিষয়ই নয় সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করতে অন্যান্যদের তুলনায় সর্বদাই অধিক সচেষ্ট থাকেন, যদিও কর্ম-কর্তার নিজস্ব নৈতিক মূল্যায়নে উদ্দেশ্য একটি যথার্থই বিচার্য বিষয় বলে তাঁরা মনে করেন। কেউ যদি তার সহসৃষ্টির মধ্যে একজনকে ডুবে যাওয়া থেকে উদ্ধার করে তবে তার কাজটি অবশ্যই নৈতিক দিক থেকে সঙ্গত হবে, তার এই কাজটির উৎস কর্তব্যবোধই হোক বা তার মনে অবস্থিত তাকে এই কাজের শ্রমের পরিবর্তে কোন মজুরী দেয়া হবে সেই আশাই হোক। আবার কেউ যদি তার বন্ধুর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে সেটা অপরাধই হবে, এমন কি যদি তার উদ্দেশ্য অন্য আরেক বন্ধুর কাজ হাসিল করা হয়, যে-বন্ধুটির প্রতি সে কোন কারণে অধিকতর বাধ্যতাবোধে জড়িত। তবে শুধুমাত্র কর্তব্যবোধ থেকে কাজ সম্পাদন করা এবং নীতিটির প্রতি প্রত্যক্ষ বাধ্যতাবোধে থেকে কাজ সম্পাদন করা সম্বন্ধে বলতে গেলে বলতে হয়: উপযোগবাদীর চিন্তা-ভাবনা সম্বন্ধে এমন মনে করা ভ্রান্ত হবে যে এই ধারাটি এমন ইঙ্গিতই দেয় যে সমগ্র বিশ্বের প্রতি বা বৃহত্তর সমাজের প্রতি সকল মানুষের জন্য সর্বদাই তাদের মন নিবিষ্ট করা উচিত হবে। অধিকাংশ শুভ কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল বাস্তবায়ন করা নয়, বরং ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গলই উদ্দেশ্য রূপে কাজ করে; এবং ব্যক্তিবিশেষের মঙ্গল দিয়েই সমগ্র বিশ্বের মঙ্গল গঠিত হয়। এমন কি সর্বাপেক্ষা সদগুণ-সম্বলিত ব্যক্তির চিন্তা-ভাবনাকেও এমন ক্ষেত্রে বিশেষ কোন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উর্ধ্বে যেতে হবে তেমন বলা যায় না। এমন ক্ষেত্রে তাঁকে কেবলমাত্র এইটুকুই মনে রাখতে হবে যে ব্যক্তি বিশেষের উপকার করতে গিয়ে অন্য কারো অধিকারের উপর তিনি হস্তক্ষেপ করছেন না, অর্থাৎ তিনি অন্য কারো ন্যায়ত প্রাপ্য এবং আইনত প্রাপ্য আশা আকাঙ্ক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করছেন না। উপযোগবাদীয় নীতিবিদ্যা অনুসারে সদগুণের উদ্দেশ্যই আনন্দের অতিদ্রুত বৃদ্ধিকরণ: কোন ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যকভাবে এই উদ্দেশ্য সাধন করার মত অবস্থা তৈরী হওয়া একটি অত্যন্ত অতিক্রমী ব্যাপার (এক সহস্রে একজন ব্যক্তির বেলায় এমনটি ঘটতে পারে)—অন্য কথায়, সর্বসাধারণের জন্য পরোপকারী হওয়া একটি অত্যন্ত ব্যতিক্রমী ব্যাপার। শুধুমাত্র এই সকল অবস্থায় সর্বসাধারণের উপযোগিতা বাস্তবায়নের ব্যাপারটা বিবেচ্য বলে গণ্য হয়। অন্যান্য সকল ক্ষেত্রেই ব্যক্তিগত উপযোগিতা, অর্থাৎ কয়েক জন ব্যক্তির স্বার্থ বা আনন্দ সম্বন্ধেই তাকে বিবেচনা করতে হয়।

BanglaBook.org

কেবলমাত্র যাঁদের কার্যকলাপ সাধারণভাবে সমাজকে প্রভাবিত করে থাকে তাঁদেরকেই অভ্যাসগতভাবে এত ব্যাপক একটি বিষয়কে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। কোন কাজ থেকে বিরত থাকার ক্ষেত্রে নৈতিক বিবেচনার পর যে সকল কাজ সম্পাদন থেকে লোকেরা বিরত থাকে যদিও বা কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এমন কাজের ফলাফল উপকারীও হয়, যথার্থই একজন বুদ্ধিমান কর্মকর্তার পক্ষে এমন হওয়া যথার্থ হবে না যে তিনি ঐ শ্রেণীভুক্ত কার্যকলাপ করবেন যে-সকল কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি সচেতনভাবে জ্ঞাত থাকবেন না যে ঐ ধরনের কার্যকলাপ সাধারণভাবে সম্পাদন করা হলে সর্বসাধারণের জন্য ক্ষতিকর হবে, এবং এটাই হল এই ধরনের কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকার পক্ষে কর্তব্যবোধের ভিত্তি। এইভাবে উপযোগবাদে সর্বসাধারণের স্বার্থের প্রতি এইরূপ গুরুত্ব আরোপ করার মাত্রা অন্য যে-কোন নৈতিক ব্যবস্থা যেরূপ দাবী করে তার থেকে কোন অংশে অধিক নয়, কারণ সকল নৈতিক ব্যবস্থাতেই যে-কাজ সুস্পষ্টরূপে সমাজের জন্য ক্ষতিকর সে-কাজ থেকে বিরত থাকার বিধান আছে।

এই একই বিবেচনা উপযোগবাদ নীতির বিরুদ্ধে অন্য আরেকটি আপত্তিকেও বাতিল করে দেয়। এই আপত্তিটি নৈতিকতার মানদণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে এবং "সঙ্গততা" এবং "অসঙ্গততা" শব্দগুলোর যথার্থ অর্থ সম্বন্ধে অধিকতর স্থূল একটি ভ্রান্ত ধারণার উপর ভিত্তিশীল। এমন কথা প্রায়ই দৃঢ়ভাবে বলা হয় যে উপযোগবাদ মানুষকে আবেগহীনভাবে শীতল এবং সহানুভূতিহীন করে তোলে; এই মতবাদ ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে মানুষের নৈতিক অনুভূতিকে বরফের মত শীতল করে দেয়; এই মতবাদ তাদের শুধুমাত্র কার্যকলাপের ফলাফলকে শুষ্ক ও সুকঠিনভাবে বিবেচনা করতে শেখায়, কার্যকলাপের নৈতিক মূল্যায়নে ঐ সকল কাজ কি গুণাগুণ থেকে উৎসারিত হচ্ছে সেই বিবেচনাকে তারা অন্তর্ভুক্ত করে না। যদি এই অভিমত দ্বারা এমন বোঝায় যে যে-ব্যক্তি কাজটি সম্পাদন করছে তার নিজস্ব গুণাগুণ সম্বন্ধে বিবেচনা কাজটির ন্যায়সঙ্গততার বা ন্যায়বিগর্হিততার বিচারকে প্রভাবিত করে না, তবে এই অভিযোগ শুধুমাত্র উপযোগবাদের বিরুদ্ধেই করা হবে না, বরং সকল নৈতিক মানদণ্ডের বিরুদ্ধেই করা হবে। কারণ এমনটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, আমাদের জানা যে-কোন নৈতিক মানদণ্ডই কাজের ভালত্ব বা মন্দত্বের বিচার করতে গিয়ে সেটা ভাল মানুষের দ্বারা বা মন্দ মানুষের দ্বারা সম্পাদিত হয়েছে সে বিষয়কে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করে না; এমন কি কাজটি একজন বিশ্বাসী, সাহসী বা পরোপকারী ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হল, না এর ঠিক বিপরীতধর্মী চরিত্রের ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হল সেই সব বিষয় এই বিবেচনাভুক্ত হয় না। এই সকল বিবেচনা শুধুমাত্র ব্যক্তির নৈতিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেই

BanglaBook.org

বিবেচ্য, কাজের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নয়। ব্যক্তির মূল্যায়ন করতে গিয়ে যে তার কাজের ন্যায়সঙ্গততা বা ন্যায়বিগর্হিততার বিষয়টি বাদ দিয়ে অন্যান্য দিকগুলোর প্রতি আমরা আমাদের আগ্রহ প্রকাশ করি এ নিয়ে উপযোগবাদ মতবাদে সঙ্গতিহীন কিছুই আছে বলে মনে হয় না। বস্তুতই কিন্তু স্টোয়েকবাদী দার্শনিকেরা ভাষার কূটাভাসপূর্ণ ব্যবহার করেছেন এবং এই ব্যবহার তাঁদের দার্শনিক পদ্ধতির একটি প্রধান অংশবিশেষ, এবং এই পদ্ধতি দ্বারা সদগুণ ব্যতীত অন্য সকল কিছুকে তাঁরা বিবেচনার বহির্ভূত করেছেন। এইভাবে তাঁরা এই অভিমতও অতি আনন্দের সাথে ব্যক্ত করেছেন যে যাঁর সদগুণ আছে তাঁর সকল কিছুই রয়েছে, এবং এক-মাত্র সেই কারণেই মানব সমাজে তিনিই ধনী, সুন্দর ও সম্রাট বলে গণ্য হবেন। অবশ্যই মানতে হবে যে উপযোগবাদীয় মতবাদে সদগুণসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে এই ধরনের কোন দাবী করা হয় না। উপযোগবাদীরা এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন যে সদগুণ ব্যতীত আরও বহু কাম্য জিনিস ও গুণাগুণ আছে, এবং ঐ সকল জিনিস ও গুণাগুণকে সেগুলোর প্রাপ্য পূর্ণ মর্যাদা দিতে সর্বদাই তাঁদের সম্পূর্ণ প্রস্তুত থাকতে হবে। তাঁরা এ বিষয়েও সচেতন যে, একটি সঙ্গত কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সদগুণসম্পন্ন চরিত্র আবশ্যক নয় এবং দোষারোপযোগ্য কাজ প্রায়শই প্রসংশাযোগ্য তেমন গুণাগুণসম্পন্ন চরিত্র থেকেই উৎসারিত হয়। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে যখন এই বিষয়টির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটে তখন এর দ্বারা তাঁদের মূল্যায়ন পরিবর্তিত হয়, তবে এই মূল্যায়ন কোন কাজ সম্বন্ধীয় নয়, কেবলমাত্র কর্মকর্তার মূল্যায়ন সম্বন্ধীয়। এসত্ত্বেও কিন্তু আমি স্বীকার করি যে, শেষ পর্যন্ত ভাল কাজ দ্বারাই ভাল চরিত্রের প্রমাণ পাওয়া সম্ভব এই অভিমতই উপযোগবাদীরা পোষণ করেন এবং তাঁরা সর্বদাই মন্দ আচরণ উৎপাদনের প্রবণতা আছে তেমন মানসিক অবস্থাকে দৃঢ়ভাবেই ভাল বলে বিবেচনা করতে অস্বীকার করেন। এই কারণে বহু ব্যক্তির নিকট তাঁরা অপ্রিয় হয়ে পড়েন। কিন্তু যাঁরা ন্যায়-সঙ্গততা ও ন্যায়বিগর্হিততার মধ্যে পার্থক্যটিকে অত্যন্ত গুরুতরভাবে প্রধান বলে মনে করেন তাঁদের মতো উপযোগবাদীদেরও এই ধরনের অপ্রিয় হয়ে ওঠাকে সহ্য করতে হয়। সুতরাং উপযোগবাদের বিরুদ্ধে উপরোক্ত আপত্তিটিকে খণ্ডন করার বিষয়টি নিয়ে কোন বিবেকবান উপযোগবাদীর চিন্তা-ভাবনা করার প্রয়োজন পড়ে না।

তবে এই আপত্তিটি দ্বারা যদি শুধু এইটুকু বোঝায় যে কোন উপযোগবাদী কাজের নৈতিকতাকে অত্যন্ত পৃথক করে উপযোগবাদীয় মানদণ্ডের বিচারে বিচার করেন এবং একজন মানুষকে প্রিয় ও প্রশংসনীয় করে তুলতে চরিত্রের যে-সকল সৌন্দর্য প্রয়োজনীয় সেগুলোকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেন না, তবে অবশ্য এই আপত্তিকে মানতেই

BanglaBook.org

হবে। উপযোগবাদীদের মধ্যেও যাঁরা শুধুমাত্র তাঁদের নৈতিক অনুভূতির চর্চা করেন কিন্তু সমবেদনা বা নান্দনিক প্রত্যক্ষণের চর্চা করা থেকে বিরত থাকেন, তাঁরা যথার্থই এই ভুলটি করে থাকেন। তবে [শুধু উপযোগবাদী নীতিবিদ নয়] অন্যান্য সকল নীতিবিদই এমন অবস্থায় এই একই ভুল করে থাকেন। অন্যান্য নীতিবিদদের পক্ষ হয়ে যেমন বলা যায় এই উপযোগবাদীদের পক্ষ হয়েও সেই একই কথা বলা যেতে পারে, যথা, ভুল যদি হয়েই থাকে তবে সে ভুল অন্যরাই করেছে বলে অনুমান করে নেয়াই উত্তম উপায়। বাস্তব বিচারে একথা বলা যায় যে, যেমনটি অন্যান্য আদর্শের অনুসারীদের মধ্যে দেখা যায় তেমনটি উপযোগবাদীদের মধ্যেও দেখা যায়: তাঁদের অনেকেই তাঁদের মানদণ্ড বা আদর্শকে কল্পনাসাধ্য নানা মাত্রায় অতি অনমনীয়ভাবে অথবা অতি নমনীয়ভাবে ব্যবহার করে থাকেন। উপযোগবাদীদের মধ্যে কেউ কেউ একেবারে গোড়াপন্থীয় অনমনীয় (Puritanically rigorous) এবং কেউ কেউ আবার এমনই হাল্কাভাবে নমনীয় হয়ে থাকেন যেমনটি শুধুমাত্র কোন পাপী ব্যক্তি বা আবেগপ্রবণ ব্যক্তির পক্ষেই হওয়া সম্ভব বলে আশঙ্কা করা যেতে পারে। তবে সামগ্রিকভাবে এমনটি বলা চলে যে, উপযোগবাদ এমন একটি মতবাদ যা নৈতিক নিয়মকে লঙ্ঘন করে তেমন আচরণকে প্রতিরোধ এবং অবদমন করার প্রতি মানবজাতির আগ্রহকে সুস্পষ্টরূপে উজ্জীবিত করে তুলছে, এবং এই মতবাদ অবশ্যই তেমন কোন মতবাদের তুলনায় নিকৃষ্টতর হতে পারে না যা এই সকলকে অনুমোদন করছে। একথা সত্য যে, "নৈতিক নিয়ম লংঘন করে কোন্ কোন্ আচরণ?" এই প্রশ্নটি সম্বন্ধে নানা নৈতিক মানদণ্ডের বা আদর্শের অনুসারীরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করে আসছেন। তবে একথা সঠিক যে নৈতিক প্রশ্নের ব্যাপারে মতামতের বিভিন্নতার সাথে পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব সর্ব প্রথম উপযোগবাদ পালন করে নি। বরং এই নীতি সকল সময় সহজ উপায়ে না হলেও, অন্তত পক্ষে একটি বাস্তব এবং বুদ্ধিগ্রাহ্য পদ্ধতি দ্বারা এই নানা প্রকারের ভিন্ন ধারণার মধ্যে একটি সমঝোতা আনয়নের প্রয়াস পেয়েছে।

উপযোগবাদীয় নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে সাধারণ বিভ্রান্তিগুলোর মধ্যে আরো কয়েকটিকে উল্লেখ করা বোধহয় বাহুল্য হবে না। এইগুলো এমন ধরনের বিভ্রান্তি যা অত্যন্ত সুস্পষ্ট এবং স্থূল, এবং যে-কোন বুদ্ধিমান ও নিষ্পাপ ব্যক্তির পক্ষে এইগুলো দ্বারা বিভ্রান্ত হওয়া অসম্ভব বলে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু যথেষ্ট মানসিক উৎকর্ষসম্পন্ন ব্যক্তিরাও কদাচিৎই যে-মতবাদের বিরুদ্ধে তাঁদের সংস্কারকে লালন করছেন সেটা সম্বন্ধে সুচিন্তিতভাবে কষ্টকর চিন্তা-ভাবনা করেন; এবং সাধারণভাবে মানুষ সত্যি সত্যিই কিন্তু তাদের এই ধরনের ঐচ্ছিক অজ্ঞতা সম্বন্ধে

BanglaBook.org

অতিশয় স্বল্প মাত্রায়ই সচেতন হয়ে থাকেন। এই কারণেই যাঁরা নিজেদের অত্যন্ত নীতিবান এবং উচ্চতর জীবন দর্শনে বিশ্বাসী ব্যক্তি বলে ভান করেন তাঁদের লেখনীর মাধ্যমেও নৈতিক নীতি সম্বন্ধে সর্বাপেক্ষা নীচ মন্তব্য প্রকাশ পায়। এমন অবস্থায় এমন মন্তব্য শোনাও আমাদের জন্য অসাধারণ কিছু নয় যে উপযোগনীতিটি একটি **ঈশ্বরবিহীন** মতবাদ। এই ধরনের ভিত্তিহীন অনুমানের বিরুদ্ধে কিছু বলা যদি নিতান্তই আবশ্যক হয় তবে আমরা বলতে পারি যে, এই সমস্যাটির আলোচনা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে আমরা ঈশ্বরের নৈতিক চরিত্র সম্বন্ধে কি ধরনের ধারণা পোষণ করছি তার উপর। তবে যদি সত্য বিশ্বাস এমন হয় যে ঈশ্বর সব কিছুর উপরে তাঁর সৃষ্টজীবের আনন্দকেই কামনা করেন এবং এটাই যদি তাঁর সৃষ্টির চরম উদ্দেশ্য হয়, তবে বলতে হয় উপযোগবাদ ঈশ্বরবিহীন কোন মতবাদ তো নয়-ই, বরং অন্য যে-কোন নীতির তুলনায় উপযোগবাদ অধিকতর সুস্পষ্ট রূপে একটি ধর্মীয় নীতি। তবে যদি এমন বোঝানো হয় যে উপযোগবাদ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দ্বারা প্রকাশ্য অভীপ্সাকে চরম নৈতিক নিয়ম বলে মানে না, তবে আমার উত্তর হবে এই যে একজন উপযোগবাদী **ঈশ্বরের** পূর্ণ প্রজ্ঞা ও পূর্ণমঙ্গলময়তায় বিশ্বাস করেন এবং এই যে ঈশ্বর তিনি নৈতিকতার বিষয়ে যা কিছু প্রত্যাদেশের মাধ্যমে প্রকাশ করবেন তা আবশ্যিকভাবেই উপযোগের প্রয়োজনীয়তার দিকটিকে সম্পূর্ণরূপে পূর্ণ করবে সেই বিশ্বাসও তাঁর আছে। তবে উপযোগবাদী ব্যতীত অন্য অনেকেই আবার এই অভিমত পোষণ করেন যে, খ্রীস্টীয় প্রত্যাদেশের (Revelation) উদ্দেশ্যই হল এবং এর দ্বারাই একমাত্র সম্ভব, মানবজাতির হৃদয় ও মনকে সেই আবেগ দ্বারা পরিপূর্ণ করে তোলা যে-আবেগের সাহায্যে মানুষ কি সঙ্গত তা নিরূপণ করতে পারবে এবং এইরূপে সঙ্গতভাবে সঙ্গত কাজ সম্পাদন করতে সক্ষম হবে; এই আবেগ অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে এই কাজগুলো যে কি হবে তা বলে দিবে না, শুধু সাধারণ একটা ধারণা দিবে মাত্র; এবং আমাদের তেমন একটি নৈতিক নীতিই আবশ্যক যার দ্বারা অতি যত্নসহকারে ঈশ্বরের অভীপ্সা সম্বন্ধে আমাদের নিকট সুস্পষ্টরূপে **ভাষ্য দান** করা হবে। এই অভিমত সঠিক কিনা সে বিষয়টিকে এইখানে বিবেচনা করা অতিরিক্ত হয়ে উঠতে পারে। কারণ প্রাকৃতিক বা প্রত্যাদেশগত এই উভয় ধরনের ধর্মের বিষয়েই একথা বলা যায় যে ধর্ম যদি নৈতিক অনুষ্ঠাকে সহায়তা করে তবে এই সাহায্য উপযোগবাদী নীতিবিদসহ সকল নীতিবিদের উপরই সমভাবে প্রযোজ্য হবে। একজন উপযোগবাদী ঈশ্বরের সাক্ষ্য দানকে যে-কোন নির্ধারিত কর্মপদ্ধতির জন্য উপকারী বা ক্ষতিকারক বলে ব্যবহার করতে পারেন, যেমনটি অন্য অনেকে তাদের অভি-

BanglaBook.org

প্রাকৃত নিয়মের সপক্ষে বা বিপক্ষে ঠিক একই প্রকারে ব্যবহার করতে পারেন, যে-সকল নিয়মের সাথে উপকারিতা বা আনন্দের কোন সম্বন্ধই নাই।

উপরন্তু, উপযোগকে প্রায়শই সংক্ষিপ্তভাবে "সুবিধাবাদিতা" এই নামকরণ করে একটি অর্থনৈতিক নীতি বলে মন্দ মনে করা হয়। এইভাবে এই নীতির বিপক্ষীয় মতবাদীরা "সুবিধাবাদিতা" এই পদটির বিপরীত অর্থবহনকারী অর্থটিকে ব্যবহার করে সুযোগ গ্রহণ করে থাকেন। কিন্তু সুবিধাবাদী বলতে সাধারণভাবে কর্মকর্তার নিজস্ব বিশেষ কোন স্বার্থ রক্ষা করাকে বোঝায়; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা চলে, যখন একজন মন্ত্রী তার মন্ত্রীত্ব সংরক্ষণের জন্য দেশের স্বার্থকে বলি দেয় তখন সেটাকে সুবিধাজনক কাজ বলা যায়। যখন এই পদটির দ্বারা এর থেকে উত্তম অন্য কোন কিছুকে বোঝায় তখন সুবিধাবাদিতা বলতে তাৎক্ষণিক কোন কিছুকে অথবা কোন সাময়িক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কার্যকরী কিছুকে বোঝাবে, তবে যার দ্বারা এমন কোন নিয়মকে খণ্ডন করা হয় যা মেনে চললে বরং অত্যন্ত অধিক মাত্রায় সুবিধাজনক প্রাপ্তি হত। এই অর্থে সুবিধাবাদী হওয়া উপকারী কিছু তো নয়ই, বরং সেটা ক্ষতিকারক কিছুরই শাখা প্রশাখা হয়ে দাঁড়ায়। এইভাবে প্রায়শই মুহূর্তের কোন লজ্জাকর অবস্থা থেকে বাঁচতে গিয়ে অথবা কোন কিছু তাৎক্ষণিকভাবে আমাদের নিজেদের জন্য বা অন্য কারো জন্য পেতে চাইলেও মিথ্যে কথা বলে ফেলার মত কাজকে সুবিধাজনক কাজ বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আমাদের আচরণের জন্য কার্যকরী হবে সেই বিবেচনায় সত্যনিষ্ঠতার বিষয়টি সম্বন্ধে আমাদের মনে একটি সূক্ষ্ম অনুভূতির চর্চা করাকে সর্বাপেক্ষা উপকারী নিয়মগুলোর অন্যতম একটি বলে বিবেচনা করা উচিত হবে এবং ঐ অনুভূতিকে ভোঁতা করে দেয়াকে সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকারক জিনিস-গুলোর অন্যতম একটি বলে বিবেচনা করা উচিত হবে। আবার ইচ্ছাবশত না হয়েও যদি মানুষের উক্তির সত্যতার উপর বিশ্বাসটি আমাদের মনে দুর্বল হয়ে পড়ে তবে ফলস্বরূপ অন্য যা কিছুর উপর বৃহত্তর মাত্রায় মানবজাতির আনন্দ নির্ভর করছে সেগুলো বাস্তবায়নের পথে নানাবিধ বাধা বিপত্তির সৃষ্টি হবে, এবং এই বিশ্বাস শুধুমাত্র যে বর্তমান জগতের সকল সামাজিক কল্যাণ ও মঙ্গলের জন্যই মৌলিক তা নয় বরং এই বিশ্বাসের ঘাটতি সততা, সদগুণ প্রভৃতির জন্যও ক্ষতিকারক হবে—এই তথ্যের বিচারে আমাদের মতে বর্তমানের সুবিধার জন্য এই নিয়ম খণ্ডনের কাজটির তথা অপ্রাকৃত সুবিধাজনকতা যথার্থ অর্থে সুবিধাজনক নয়। উপরন্তু, যে-ব্যক্তি নিজের সুবিধার জন্য বা অন্য কোন ব্যক্তি-বিশেষের সুবিধার জন্য এমন কোন কাজ সম্পাদন করে যার দ্বারা সমস্ত মানব-জাতিকে বঞ্চিত করা হবে এবং মানবজাতির জন্য অমঙ্গল সাধন করা হবে, সেই ব্যক্তি

BanglaBook.org

এইভাবে মানবজাতির সর্ব-নিকৃষ্ট শত্রুর মতন কাজ করবে, কারণ এই ধরনের কাজই মানুষের প্রতি মানুষের বিশ্বাসকে বিনষ্ট করার সাথে অন্ধ-বিস্তর জড়িত থাকে। তবে একথাটিও মনে রাখা আবশ্যক যে এই যে-নিয়ম সেটা যত অধিক পবিত্রই হোক-না-কেন এটারও যে ব্যতিক্রম হতে পারে সেকথাটিও নীতিবিদরা স্বীকার করেন। যে-সকল অবস্থায় সত্যকে আড়াল করার কাজটি (যেমন, কোন পরক্ষতিকারীর নিকট থেকে তথ্যাদি লুকিয়ে রাখা বা কোন আশঙ্কাজনকভাবে অসুস্থ ব্যক্তির নিকট দুঃসংবাদ লুকিয়ে রাখা) কোন ব্যক্তিবিশেষকে কোন বড় এবং অযথা বিপদ থেকে বাঁচাতে পারে যখন সেই ব্যক্তি নিজে না হয়ে অন্য কোন ব্যক্তি হয়, এবং যখন এই লুকিয়ে রাখার ব্যাপার শুধুমাত্র সত্যকে আড়াল করে রাখার মাধ্যমেই সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। কিন্তু এই যে ব্যতিক্রমী কাজ এটাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যাপক ব্যবহার করাকে প্রতিরোধ করতে হবে এবং সত্যনিষ্ঠার উপর বিশ্বাসকে দুর্বল করার উপর এই ব্যতিক্রমী কাজের প্রভাব যে পড়তে পারে সেই দিকটি স্মরণে রেখে বিষয়টিকে অনুধাবন করা উচিত হবে এবং সম্ভব হলে এই ব্যতিক্রমিতার সীমাকে সুস্পষ্ট রূপে সংজ্ঞায়িত করে দেয়া আবশ্যক হবে। উপযোগ নীতিটিকে যদি বিন্দুমাত্রও কার্যকরী হতে হয় তবে এই নীতিটিকে অবশ্যই এই সকল সংঘাতমূলক উপযোগের সকলগুলোকে তুলনামূলক মূল্যায়ন করতে হবে, এবং এইগুলোর প্রত্যেকটির যথাযথ সীমা নির্ধারণ করে একটি অপরটিকে কিভাবে [গুণে ও পরিমাণে] ওজনে ছাড়িয়ে যাচ্ছে সেটা সুস্পষ্ট করে দিতে হবে।

আবার এই ধরনের আপত্তি খণ্ডনের জন্যও উপযোগবাদের প্রতিরক্ষাকারীদের আহ্বান করা হয়—যেমন, সাধারণ আনন্দের উপর কোন কাজের যে কি ফলাফল হতে পারে সেটা হিসাব করা বা ওজন করে দেখার সময় পাওয়া যায় না। এই আপত্তিটি ঠিক ঐ রকমই শোনায় যখন কেউ একজন বলে যে খ্রীস্টীয় ধর্ম দ্বারা আমাদের আচরণকে পরিচালনা করা সম্ভব নয়, কারণ প্রতিটি পরিস্থিতিতে আমাদের পক্ষে ওল্ড বা নিউ টেস্টামেন্ট থেকে সেই বিশেষ পরিস্থিতির বিচারে কি করণীয় হবে তা বুঝবার মত সময়ও আমাদের হাতে নাই। এই আপত্তিটির সঠিক উত্তরটি হল: আমাদের হাতে তো অতীতে অনেকটা সময়ই ছিল, যেমন মানব জাতির সমগ্র অতীত কালটা ধরেই আমরা এই ধরনের হিসেব করার এবং ওজন করার সময় হাতে পেয়েছি। ঐ সমস্ত কালটাতেই মানব জাতি অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কাজের প্রবণতা সম্বন্ধে জানার সুযোগ পেয়েছে। এই অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের উপরই নির্ভর করছে মানব জাতির দূরদর্শিতা এবং জীবনের নৈতিকতা। লোকদের কথাবার্তায় মনে হয় যেন এই অভিজ্ঞতার ধারাটির উৎস ইতিপূর্বেই রুদ্ধ হয়ে গেছে,

BanglaBook.org

আর এই অবস্থায় এখন যদি কেউ কারো সম্পত্তি বা প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে প্রলোভিত হয় তবে তাকে যেন সেই প্রথম বারের মত খুন করা বা চুরি করা মানুষের আনন্দের জন্য ক্ষতিকারক কিনা তা বিবেচনা করে দেখতে হবে। যদি তেমনটি হতও তবু কিন্তু আমার মনে হয় না যে মানুষের জন্য এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া খুব সমস্যাবহুল হয়ে দাঁড়াত। তবে এ সত্ত্বেও মানুষকে কিছু সমস্যায় পড়তেই হয়। এটা যথার্থই একটা খেয়ালী অনুমান করা হবে যদি বলা হয় যে, যদি মানব জাতি নৈতিকতার অভীক্ষা হিসেবে উপযোগিতাকেই বিবেচনা করতে সর্বসম্মতভাবে চুক্তিবদ্ধও হয় তবু কি যে উপযোগী হবে সে-নিয়ে তারা চুক্তিবদ্ধ হতে পারবে না, এবং এমন কি কি পদ্ধতি গ্রহণ করে তরুণদের উপযোগনীতি সম্বন্ধে শিক্ষা প্রদান করা যাবে এবং আইন ও অভিমতের সহায়তায় কিভাবে তাদেরকে উপযোগবাদীয় আদর্শের প্রতি চালিত হতে বাধ্য করা যাবে তা নিয়েও একমত হতে পারবে না। সার্বজনীন এইরূপ নির্বুদ্ধিতাকে যদি এই অবস্থার সাথে যুক্ত রয়েছে বলে অনুমান করে নেয়া হয় তবে যে-কোন নৈতিক মানদণ্ডের অকার্যকারিতাকে প্রমাণ করা মোটেও কষ্টসাধ্য হবে না। কিন্তু কোন ব্যবস্থার সাথে এই অনুমানকে সংযুক্ত না করে শুধু এ কথা বলা যায় যে মানব জাতি নিশ্চিত রূপেই এত কালের অভিজ্ঞতার দ্বারা কিছু কাজের ফলাফল যে নিশ্চিত রূপেই তাদের আনন্দের উপর প্রভাব বিস্তার করে সে-বিশ্বাস অর্জন করেছে। এইভাবে অর্জিত যে-বিশ্বাস তা জনতার জন্য নৈতিকতার নীতিমালা বলে গণ্য হতে পারে, এবং এমন কি যতদিন পর্যন্ত দার্শনিকেরা অধিকতর উত্তম নীতিমালা খুঁজে না পাচ্ছেন ততদিন পর্যন্ত তাদের জন্যও তেমনই হতে পারে। আমি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এই মত পোষণ করি বা একথা স্বীকার করি যে, এখনও দার্শনিকদের পক্ষে বহু বিষয়ে এই ধরনের কাজ অতি সহজেই সম্পন্ন করা সম্ভব এবং আজ পর্যন্ত প্রাপ্ত কোন নৈতিক নীতিমালাকে কোন প্রকারেই ঐশ্বরিক অবদান বলে দাবী করা যায় না। একথাও আমি স্বীকার করি যে মানব জাতির জন্য এখনও পর্যন্ত সাধারণ আনন্দের উপর কাজের প্রভাব সম্বন্ধীয় আরও বহু তথ্যাদি জানার আছে। উপযোগনীতি থেকে প্রাপ্ত অনুসিদ্ধান্তগুলোর অসীম উন্নতি সাধন সম্ভব, ঠিক যেমনটি সম্ভব প্রত্যেক ব্যবহারিক কলার কল্পমূর্তি তৈরীর রীতিনীতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে। মানুষের প্রগতিশীল মননের প্রেক্ষিতে এই উন্নতি সাধন ক্রমান্বয়েই ঘটে চলেছে। তবে নৈতিকতার নীতিমালাকে উন্নতি সাধনযোগ্য বলে মনে করা এক কথা, আর এই প্রাথমিক নীতির মাধ্যমে প্রতিটি বিশেষ কাজের প্রত্যক্ষ অভীক্ষাকরণের প্রচেষ্টা করা এবং মাধ্যমিক নীতিকে সাধিকীকরণের দিকে চালিত করা ভিন্ন কথা। তবে প্রাথমিক নীতিকে মেনে নিলে যে মাধ্যমিক

BanglaBook.org

নীতিকে মানার ব্যাপারটি বিরোধিতামূলক হবে এমন ধারণা করা একটি অদ্ভুত ব্যাপার। একজন ভ্রমণকারীকে তার চরম গন্তব্য স্থানটি সম্বন্ধে তথ্য দিতে গিয়ে তাকে পথের বৈশিষ্ট্য এবং দিকনির্ণায়ক স্তম্ভগুলো ব্যবহার করা নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করার কথা নয়। আনন্দ যে নৈতিকতার চরম লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এই উক্তি দ্বারা এমন বুঝায় না যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কোন উপায়ই নির্ধারণ করে দেয়া যাবে না, অথবা যারা এই লক্ষ্যে পৌঁছতে চায় তাদেরকে এক পথ ছেড়ে অন্য পথে যাবার উপদেশ দেয়া যাবে না। এই বিষয়ে এই ধরনের অর্থহীন কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকা নিতান্তই উচিত। অন্যান্য ব্যবহারিক বাস্তব বিষয় প্রসঙ্গে এ ধরনের কথাবার্তা বলাও হয় না বা বললেও কেউ শোনে না। কেউ কখনও এমন বলে তর্ক করে না যে নাবিকেরা যেহেতু নৌচারণী (Nautical Almanac) নিয়ে সর্বদা হিসাব করে না যেহেতু নৌচালনাবিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণী হিসেবে তারা সমস্ত হিসাব-নিকাশ সারা করেই সমুদ্র-যাত্রা শুরু করে। সকল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণীই সঙ্গতি আর অসঙ্গতি সম্বন্ধে সাধারণ সমস্যাগুলো নিয়ে মন স্থির করে নিয়েই জীবন-সমুদ্র পাড়ি দেয়, যেমন প্রজ্ঞাশীল ব্যক্তিরা সময় থাকতেই নির্বোধ ব্যক্তিদের অধিকতর কঠিন প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে মনস্থির করে নেন। এই যে দূরদর্শিতা এটা একটা মানবিক গুণ। এইরূপ দূরদর্শী চিন্তা-ভাবনা মানুষ যে অবিরাম করতেই থাকবে সেটা অনুমান করে নেয়া যায়। নৈতিকতার মৌলিক নীতি বলে আমরা যেটাকেই গ্রহণ করি না কেন, ঐ নীতিকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্য আবার আমাদের বহু অন্যান্য অধীনস্থ নীতির (subordinate principle) প্রয়োজন হয়। এই ধরনের অধীনস্থ নীতির সাহায্য ব্যতিরেকে যে এই প্রয়োগের কাজটি অসম্ভব এই যুক্তি শুধুমাত্র কোন একটি বিশেষ ব্যবস্থার ব্যাপারেই প্রযোজ্য নয়। কারণ সকল ব্যবস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করেই সাধারণভাবে এ যুক্তিটি প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হয়। কোন প্রকারের মাধ্যমিক নীতি থাকতে পারে না, বা মানব জাতিকে বর্তমানে ও ভবিষ্যতেও অবশ্যই জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকতে হবে, যখন এই ধরনের বক্তব্য গুরুত্বসহকারে প্রকাশ করা হয় তখনই আমার মতে, দার্শনিক বিরোধ একেবারে শীর্ষ স্থানে গিয়ে পৌঁছে যায়।

উপযোগবাদের বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তিগুলোর মধ্যে বাকীগুলোর অধিকাংশই মানুষের সাধারণ দুর্বলতার প্রতি এবং কার্যের ধারা নির্ণয়ের বিষয়ে বিবেকবান ব্যক্তিদের যে বিপদে পড়তে হয় সেই তথ্যের প্রতি ইঙ্গিত দেয়। এমন বলা হয় যে একজন উপযোগবাদীর নিজের বেলায় নৈতিক নিয়মের ব্যতিক্রম মনে করে নেয়ার প্রবণতা থাকে এবং প্রলোভনের বশীভূত হয়ে কোন একটি নিয়ম

BanglaBook.org

পালনের চেয়ে নিয়ম ভঙ্গ করার উপযোগিতা তার নিকট অধিক বলে প্রতীয়-মান হতে পারে। কিন্তু মন্দকার্য সম্পাদনের এবং বিবেককে ফাঁকি দেবার অজু-হাত পাবার উপায় পেতে চাইলে উপযোগবাদই কি একমাত্র মতবাদ যা এইরূপ সুযোগ দিয়ে থাকে? নৈতিকতার ক্ষেত্রে বিরোধী বিবেচনার বাস্তব অস্তিত্বকে স্বীকার করে নেয় যে সকল মতবাদ সেইগুলোতে যে এই ধরনের সুযোগ প্রচুর পরিমাণে রয়েছে, এ কথা সকল সুস্থির ব্যক্তিই বিশ্বাস করেন। এটা কোন বিশ্বাসের ত্রুটির কারণে নয়, বরং মানব অবস্থার প্রাকৃতিক জটিলতার কারণেই আচরণের কোন নিয়মকেই ব্যতিক্রম-অসম্ভব বলে গণ্য করা যায় না। এই কারণেই কদাচিৎই কোন একটি বিশেষ শ্রেণীর কাজকে সম্পাদন সর্বদাই আমাদের কর্তব্য বলে গণ্য করা অথবা সর্বদাই নিন্দনীয় বলে গণ্য করা যায়। অবস্থার অনন্য বৈশিষ্ট্যকে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করতে গিয়ে কর্মকর্তার নৈতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে নিয়ম-কানুনকে কিছুটা এদিক সেদিক করে স্থান করে দেয়া হয় নি তেমন কোন নৈতিক আদর্শ নেই। এই ধরনের সুযোগ করে দেয়ার ফলে আত্ম-প্রতারণা এবং অসৎ ব্যবহারিক নৈতিকতা প্রতিটি আদর্শেই অনুপ্রবেশ করেছে। এমন কোন নৈতিক ব্যবস্থা নেই যেখানে দ্ব্যর্থক ও বিরোধী কর্তব্যের ক্ষেত্র উপস্থিত হয় না। এই হল যথার্থ বিপদ এবং তাত্ত্বিক নীতিবিদ্যা ও বিবেক অনুসরণে ব্যক্তিগত আচরণের জন্য পথ-প্রদর্শনের বিষয়ে এই খানেই রয়েছে বিভ্রান্তির উৎস। ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধিমত্তা এবং সদগুণের দ্বারাই এই সকল বিভ্রান্তিগুলোকে বাস্তব ক্ষেত্রে অল্প-বিস্তর এড়িয়ে যাওয়া হয়। তবে এমন ভান করা কদাচিৎ সম্ভব যে কোন একটি পরম মানদণ্ড অনুসরণের সাহায্যে সকল বিরোধী সঙ্গত এবং কর্তব্য কার্য সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার চেয়ে সেই রকম কোন মানদণ্ড অনুসরণ না করে এই সকল সমস্যা সমাধানে একজন ব্যক্তি অধিক উপযুক্ত হবে। যদি উপযোগই নৈতিক উচিত্যবোধের পরম উৎস হয়ে থাকে তবে যখন বিরোধী কর্তব্যগুলোর দাবী যথার্থই বিরুদ্ধধর্মী হবে তখন উপযোগকে বিবেচনা করেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। যদিও কোন মানদণ্ডের ব্যবহার একটি কষ্টসাধ্য ব্যাপার তবুও কোন মানদণ্ডের অনুপস্থিতির তুলনায় এটা অধিকতর উত্তম অবস্থা। নৈতিক নিয়মগুলোর স্বাধীন অস্তিত্ব রয়েছে এমন নৈতিক ব্যবস্থারও তেমন কোন সাধারণ আমপায়ার (umpire) নেই যার সকল প্রকারের বিরোধী কর্তব্যগুলোর মধ্যে নিষ্পত্তি সাধন করবার ক্ষমতা রয়েছে। এই নিয়মগুলোর একটির অপরটির অপেক্ষা প্রাধান্য পাবার বিষয়টি কুতর্কের চেয়ে অধিকতর উত্তম কিছুই নয়; এবং সেগুলোকে যদি উপযোগের বিচারে মেনে নেয়া না হয় তবে ব্যক্তিগত কামনা-বাসনা ও পক্ষপাতিত্ব দ্বারা কাজ

BanglaBook.org

সম্পাদনের অধিকতর সুযোগ হয়ে পড়ে। এখানে আমাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, শুধুমাত্র মাধ্যমিক নীতির মধ্যে এই ধরনের বিরোধ মেটাতেই মৌলিক নীতির সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এমন কোন নৈতিক কর্তব্যবোধের ক্ষেত্র নেই যেখানে কোন-না-কোন মাধ্যমিক নীতি জড়িত নয়। একটি মাত্র এমন ক্ষেত্র থেকে থাকলেও সেই ক্ষেত্রে যে-ব্যক্তি ঐ নীতিটিকে নিজস্ব স্বরূপে অনুধাবন করতে পারেন তাঁর মনে কোনটা সেই অবস্থা হতে পারে সেই সম্বন্ধে কদাচিৎই কোন যথার্থ সন্দেহের উদ্রেক হবে।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

তৃতীয় অধ্যায়

# উপযোগ নীতির চূড়ান্ত অনুমোদন

যে-কোন অনুমিত নৈতিক মানদণ্ড সম্বন্ধে প্রায়শই এমন প্রশ্নের উত্থাপন করা হয় এবং যথার্থই এই ধরনের প্রশ্নের উত্থাপন করা বাঞ্ছনীয়—এই মানদণ্ডের অনুমোদনটি কি? এটা মেনে চলার পেছনে প্রেষণাটিই বা কি? অথবা, আরও বিশেষভাবে বলতে হলে বলতে হয়, এটার প্রতি বাধ্যতাবোধের উৎস কোথায়? কোথা থেকে এই মানদণ্ড এর শর্তাবদ্ধ করার শক্তি (binding force) পেয়েছে? নীতিদর্শনের একটি প্রয়োজনীয় অংশ হল এই সকল প্রশ্নের উত্তর দেয়া। উপযোগবাদীয় নৈতিকতার বিরুদ্ধে এই ধরনের আপত্তি করা হয় যেন শুধুমাত্র উপযোগবাদের জন্যই এটা করণীয় কার্য, যেখানে যথার্থই সকল মানদণ্ডের ব্যাপারেই এই সকল প্রশ্ন করার বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য। বাস্তবিকই, যখনই কোন ব্যক্তি একটি মানদণ্ডকে গ্রহণ করতে চায় অথবা যখন তাকে সে অভ্যস্ত নয় তেমন কোন নৈতিক মানদণ্ডের বিচারে কোন নৈতিক বিষয়কে বুঝে নিতে হয়, তখনই এই সকল প্রশ্নের উত্তর জানা আবশ্যক হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে সমাজে চলিত নৈতিকতা, যে-নৈতিকতাকে শিক্ষা এবং মতামত দ্বারা অনুপ্রবেশ করানো হয়, হল একমাত্র নৈতিকতা যেটা নিজের মধ্যেই **বাধ্যতাবোধকে** ধারণ করছে বলে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করা হয়। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তিকে এই ধরনের চলিত নৈতিকতা ব্যতীত অন্য কোন নৈতিকতা সম্বন্ধে এমন ধারণা বিশ্বাস করতে বলা হয় যে এটার প্রতি বাধ্যতাবোধের প্রশ্নটি অন্য একটি সাধারণ নীতি থেকে উৎসারিত হয়েছে যার সাথে আচার-আচরণের আভাস পর্যন্ত কোন প্রকারে জড়িত নেই, তখন সেই উক্তি তার নিকট কূটাভাসপূর্ণ বলেই মনে হবে। সেক্ষেত্রে অনুমিত অনুসিদ্ধান্তগুলোর মধ্যেই মৌলিক সূত্র অপেক্ষা অধিকতর বাধ্যতাবোধক শক্তি রয়েছে বলে মনে করা হয়; তিত বলে যেটাকে প্রদর্শন করা হচ্ছে সেটা অপেক্ষা উপ-পাঠানোকেই অধিকতর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত বলে মনে করা হয়। সেই ব্যক্তি তখন নিজেকেই প্রশ্ন করে: বুঝতে পারছি যে ডাকাতি করা, খুন বা রাহাজানি করা বা ঠকানো প্রভৃতি না করতে আমি বাধ্য। কিন্তু সাধারণের আনন্দকে বৃদ্ধি করতে আমি বাধ্য হব কেন?

BanglaBook.org

**যদি আমার নিজস্ব আনন্দের সাথে সাধারণ আনন্দের সংঘাত হয় তবে আমি কেন নিজস্ব আনন্দকেই প্রাধান্য দেব না ?**

যদি নীতিবোধের প্রকৃতি সম্বন্ধে উপযোগবাদীয় দর্শন যে অভিমত গ্রহণ করেছে তা সঠিক হয়ে থাকে তবে সর্বদাই এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে। যতদিন পর্যন্ত উপযোগ নীতির প্রভাবে কোন কোন ফলাফলকে শুভ বলে মনে করার প্রতি নৈতিক চরিত্র গঠিত না হয় বা যতদিন পর্যন্ত শিক্ষার উন্নতি সাধনের মাধ্যমে আমাদের সহসৃষ্টিদের সাথে একাত্মবোধ আমাদের চরিত্রের মধ্যে শিকড় গেঁথে না যায় (যীশুর যে এই অভিপ্রায়ই ছিল তা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই), এবং যেমনটা কোন কোন অপরাধের প্রতি ভীতি সাধারণত সুষ্ঠুভাবে লালিত যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় তেমনভাবে আমাদের নিজেদের চরিত্রের অঙ্গীভূত অংশবিশেষ হয়ে না যায়, ততদিন পর্যন্ত আমাদের সকলকে এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতেই হবে। সে যাই হোক, ইতিমধ্যে এই কথা শুধু বলা যাবে যে এই সমস্যাটি শুধু উপযোগবাদীয় নীতির সাথেই জড়িত নয়। বরং নৈতিকতাকে বিশ্লেষণ করতে এবং তা নিয়ে নীতিমালা প্রণয়ন করার যে-কোন প্রয়াসের সাথেই এই সমস্যাটি জড়িত রয়েছে। কোন একটি নীতি যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষের মনে সেই নীতিকে প্রয়োগের ইচ্ছার সাথে একেবারে পবিত্রতার সাথে গেঁথে না যাবে সেই পর্যন্ত এই সমস্যা দূরীকরণের কোন উপায় নেই। প্রায়োগিক দিকগুলোকে শুধুমাত্র তখনই মনে হবে যেন কোন একটি পবিত্র কিছু থেকেই শুধুমাত্র উৎসারিত হচ্ছে।

উপযোগবাদীয় নীতিটির হয় অন্যান্য যে-কোন নৈতিক পদ্ধতির মতই সকল প্রকারের অনুমোদন রয়েছে, নয় এই নীতির জন্য তেমন কোন অনুমোদন থাকবে না কেন তার পক্ষে কোন যুক্তিই নেই। অনুমোদন হয় বাহ্যিক না হয় অভ্যন্তরীণ হবে। বাহ্যিক অনুমোদন সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার তেমন কিছুই নেই। সেগুলো সম্বন্ধে এইটুকুই বলা যায় যে সেগুলো হল আমাদের সহসৃষ্টিদের নিকট থেকে অথবা এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের শাসকের নিকট থেকে সহায়তা পাবার আশা অথবা নিরানন্দময় কিছু পাবার আশঙ্কা— এই সঙ্গে মিশ্রিত থাকতে পারে আমাদের সহসৃষ্টিদের প্রতি আমাদের সমবেদনা বা ভালবাসা, অথবা সৃষ্টিকর্তার প্রতি আমাদের মনে প্রেমভাব বা ভীতি ভাব থাকতে পারে, যে-কারণে আমরা নিঃস্বার্থভাবেই ঈশ্বরের অভীপ্সিত কার্যকলাপ করে যেতে পারি। অন্যান্য মতবাদের অন্তর্ভুক্ত নীতি পালনের মতই উপযোগবাদীয় নৈতিকতার নীতিগুলো পালন করার বিষয়েও কেন যে এই সকল উদ্দেশ্যগুলোই পূর্ণ মাত্রার শক্তি নিয়ে জড়িত থাকবে না তার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ স্পষ্টতই থাকতে পারে না। বস্তুতই, সেগুলোর

BanglaBook.org

মধ্যে যেগুলো আমাদের সহসৃষ্টিদের অন্তর্ভুক্ত করছে সেইগুলো মানুষের সাধারণ বুদ্ধিমত্তার সাথে সমতা রেখে সর্বদাই নিশ্চিত রূপেই তেমনটি করে থাকে। কারণ, মানুষের নৈতিক ঔচিত্যবোধের উৎস সাধারণের আনন্দ হোক আর না-ই হোক, মানুষ যে যথার্থই আনন্দকেই কামনা করে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। মানুষের নিজস্ব আচরণ সর্বাঙ্গসুন্দর না হলেও অন্যদের নিকট থেকে তারা সেইরূপ আচরণই সর্বদা কামনা করে যা সর্বাঙ্গসুন্দর; এবং তারা সেগুলোকেই প্রশংসা করে যেগুলো তাদের ব্যক্তিগত আনন্দকে বৃদ্ধি করতে সক্ষম। মানুষ যদি ঈশ্বরের ভালত্বে বিশ্বাসী হয়, যেমনটা তারা প্রকাশ্যে প্রায়শ ঘোষণা করে থাকে, তবে ধর্মীয় আদর্শের বিষয়ে এটুকুই বলা যায় যে, সর্বসাধারণের আনন্দের বাস্তবায়নে যা কিছু সহায়ক হবে তা-ই ভালত্বেরও একমাত্র মানদণ্ড বা সারসত্তা এই বিশ্বাস যারা করে তাদেরকে আবশ্যিকভাবে এই বিশ্বাসও করতে হবে যে তাদের এই বিশ্বাসের প্রতি ঈশ্বরের নিজস্ব অনুমোদন রয়েছে। সুতরাং বাহ্যিক পুরস্কার বা শাস্তির সামগ্রিক শক্তি, সেই পুরস্কার বা শাস্তি দৈহিক বা নৈতিক যেমনই হোক-না-কেন অথবা ঈশ্বর থেকে বা সহমানবের নিকট থেকে অনুসৃত হোক-না-কেন, মূলত নির্ভরশীল হচ্ছে মানব প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর ও সহসৃষ্টির মধ্যে যে-কোন একটির প্রতি নিঃস্বার্থ ভক্তির উপর। উপযোগবাদী নৈতিকতার বাস্তব প্রয়োগের জন্য এই ভক্তিই আবশ্যক, তবে এই ভক্তির সাথে এই নৈতিকতাকে অনুধাবন ও উপলব্ধি করার বিষয়টিও আনুপাতিকভাবে জড়িত হয়ে আছে; এবং এই বোধের জন্য অধিকতর উপযোগবাদী হল উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা ও জীবনযাপনের মাধ্যমে সাধারণভাবে উপযোগবাদীয় মতবাদের চর্চা করা।

বাহ্যিক অনুমোদন সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট। আমাদের কর্তব্যের মানদণ্ড যাই হোক-না-কেন, কর্তব্যের অন্তঃস্থ অনুমোদন হল একটিই এবং একটি মাত্র বিষয়ই—সেটা হল আমাদের মনের মধ্যেকার একটি আবেগময় অনুভূতি: কর্তব্য কাজ করতে অপারগ হলে এক ধরনের অল্প-বিস্তর বেদনাদায়ক যন্ত্রণা অনুভূত হয়, যে-যন্ত্রণাকে যথার্থভাবে চর্চা করা হলে আমাদের নৈতিক প্রকৃতি এমনভাবে জেগে ওঠে যে, বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ঐ সকল কর্তব্য কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই যে আবেগটি এটা যখন নিঃস্বার্থ হয় ও কর্তব্যের বিশুদ্ধ ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে, এবং কর্তব্যের কোন বিশেষ আকারের সাথে বা কোন বিশেষ পরিস্থিতির সাথে যুক্ত না হয়ে পড়ে, তখনই এটা বিবেকের সারসত্তা হয়ে যায়। যদিও এই যৌগিক ঘটনার মধ্যেই আবেগটি বাস্তবে অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে, তবুও সঠিক তথ্যটি হল এই যে আবেগটি সাধারণত অনুসৃত হয় সমবেদনা ও প্রেম থেকে এবং অধিক সময় অনুসৃত হয়

BanglaBook.org

ভীতি থেকে; সকল প্রকারের ধর্মীয় আবেগ থেকে, বাল্যকালের স্মৃতি থেকে এবং আমাদের সমগ্র বিগত জীবন থেকেও কখনও কখনও অনুসৃত হয়; আবার কখনও অনুসৃত হয় আত্ম-মর্যাদাবোধ থেকে, অন্যের প্রতি মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখার ইচ্ছা থেকে, এবং কখনও মাঝে মধ্যে আত্ম-নিগ্রহবোধ থেকেও অনুসৃত হয়। আমার মনে হয়, এই যে অতিশয় জটিল অবস্থা এটাই হল নৈতিক ঔচিত্য-বোধের এক ধরনের মরমী বৈশিষ্ট্যের উৎস; মানব মনে অবস্থিত এই ধরনের প্রবণতার মধ্যে এই বোধটি হল অন্যতম প্রধান একটি। এই মরমী চরিত্রের জন্যই সাধারণভাবে এইরূপ বিশ্বাস পরিলক্ষিত হয় যে, এই ঔচিত্যবোধের ধারণাটি আমাদের মধ্যে উপস্থিত অভিজ্ঞতার দ্বারাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে, অন্য কোন কিছু দ্বারা নয়। এই উত্তেজিত হয়ে ওঠার বিষয়টি অনুমিত একটি রহস্য-ময় সূত্রের সাথে জড়িত হয়ে রয়েছে। এমন একটি পুঞ্জীভূত অনুভূতির অস্তিত্বের মধ্যেই একটি বন্ধনশক্তি নিহিত রয়েছে। আমাদের সঙ্গততার মানদণ্ডকে ভাঙতে হলে এই পুঞ্জীভূত অনুভূতির প্রাচীর ভেদ করে বের হয়ে আসতে হয়। আবার যদি এইভাবে আমাদের মানদণ্ডটিকে ভেঙেও ফেলি তবেও খুব সম্ভবত পরবর্তীতে অনুশোচনার (remorse) মাধ্যমে আমাদেরকে সেই পুঞ্জীভূত অনুভূতির সাথে দণ্ডযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়। এই বিবেকের প্রকৃতি বা উৎস সম্বন্ধে যে-মত-বাদই আমরা প্রণয়ন করি না কেন, এই পদ্ধতি দ্বারাই সেটা সংগঠিত হয়ে থাকে।

সুতরাং সকল নৈতিকতার (বাহ্যিক উদ্দেশ্যকে বিচার না করলে) চূড়ান্ত অনুমোদন যেহেতু আমাদের মনের মধ্যেকার একটি মননির্ভর (subjective) অনুভূতি, সেহেতু যে উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন সেটাই যাদের মানদণ্ড তাদের জন্য লজ্জাকর কিছুই আমি ব্যক্তিগতভাবে দেখতে পারছি না। তাহলে এই বিশেষ মানদণ্ডটির অনুমোদনের স্বরূপটি কি হতে পারে? আমরা এই বলে এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি যে, অন্য সকল মানদণ্ডের যেই সকল অনুমোদন রয়েছে এই মানদণ্ডের সেই একই অনুমোদন আছে মানব জাতির বিবেকসম্মত অনুভূতিগুলোই। যাদের মনে এই ধরনের অনুভূতির কোন স্থানই নাই তাদের জন্য নিঃসন্দেহে এই ধরনের অনুমোদন কোন ফলপ্রসূ বস্তুই নয়। তবে এরা শুধু উপযোগবাদী নীতির প্রতিই নয়, বরং অন্য যে কোন নৈতিক নীতির প্রতিও অধিকতর বাধ্য হবে না। বাহ্যিক অনুমোদনের বন্ধন ব্যতীত অন্য কোন ধরনের নৈতিকতাই তাদের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হবে না। তবে মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে একটি বাস্তব সত্য হল এই যে মানুষের মধ্যে এই অনুভূতি অবস্থান করছে। যদি যথার্থভাবে চর্চা করা হয় তবে এক বৃহৎ শক্তি নিয়ে এই অনুভূতি মানব জাতির উপর প্রভাব

BanglaBook.org

বিস্তার করবে, এই বাস্তবতা অভিজ্ঞতা দ্বারা একটি প্রমাণিত তথ্য। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, অন্যান্য নীতিকে যেমন অতিশয় গুরুত্ব সহকারে চর্চা করা হয় তেমন করে উপযোগবাদী নীতির চর্চা কেন করা যাবে না, সে-সম্বন্ধে কখনও কোন যুক্তিই প্রদর্শন করা হয় নি।

আমি এই বিষয়ে সচেতন, এখন বিশ্বাস করার একটা প্রবণতা আমাদের আছে যে কোন ব্যক্তি যদি নৈতিক বাধ্যতাবোধকে একটি অতিপ্রাকৃত তথ্য বলে মনে করে, যেটা এমন একটি বস্তুনির্ভর সত্তা যা "নিজের মধ্যেই নিজে অস্তিত্বশীল" তেমন জিনিসের রাজ্যের একজন সদস্য, তবে সেই ব্যক্তির পক্ষে এই প্রকারের নৈতিকতার প্রতি বাধ্য হওয়া তুলনামূলকভাবে অধিকতর স্বাভাবিক তেমন কোন ব্যক্তির চেয়ে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মননির্ভর একটি নৈতিক অনুভূতিতে বিশ্বাসী, যে-অনুভূতি মানুষের চেতনের মধ্যেই শুধু বিরাজ করে। তবে কোন ব্যক্তির মনে অধিবিদ্যার (ontology) এই দিকটি নিয়ে যে-মতবিশ্বাসই থাকুক-না-কেন, যে-শক্তি দ্বারা সে এই বিশ্বাসের প্রতি তাড়িত হয় সেই শক্তিটি কিন্তু তার নিজস্ব মননির্ভর একটি অনুভূতি ভিন্ন আর কিছুই নয়, এবং এই অনুভূতির শক্তির দ্বারাই তার মনে এই বিশ্বাসের মাত্রা নির্ধারিত হয়। কারো মনে কর্তব্য যে একটি বস্তুনির্ভর সত্তা এই ধরনের বিশ্বাস ঈশ্বর যে একটি বস্তুনির্ভর [মননির্ভর নয়] সত্তা এই বিশ্বাসের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে না। তবুও কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস একটি মননির্ভর ধর্মীয় অনুভূতি হিসেবে মানব আচরণকে সেই পরিমাণে প্রভাবিত করে যে-পরিমাণে সেটা কারো মনে পূর্বেই স্থান অধিকার করে আছে; তবে এখানে পুরস্কার ও শাস্তির সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। অনুমোদনকে নিঃস্বার্থ হতে হলে সেটাকে অবশ্যই সর্বদাই মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হতে হবে। সুতরাং অতিপ্রাকৃতবাদী নীতিবিদদের ধারণা তেমনটি হতে বাধ্য যে এই অনুমোদন কখনও মনের মধ্যে অধিষ্ঠিত হতে পারে না, যদি না এর গোড়া বা শিকড় বা উৎস মনের বাইরে না থাকে। তাঁদের মতে কেউ যদি নিজেকে একথা বলতে সক্ষম হয় যে "আমাকে যা বিরত রাখছে ও আমার বিবেককে যা জীবন্ত রাখছে সেটা, শুধুমাত্র আমার নিজস্ব মনের অনুভূতি মাত্র", তবে সে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারে যে যখন তার এই অনুভূতি থাকবে না তখন আর তার কর্তব্যবোধও কাজ করবে না, এবং যদি সে সেই অনুভূতিকে অস্বস্তিজনক মনে করে তবে সেটাকে সে আর গুরুত্ব দেবে না বা সেটা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠবে। কিন্তু এই আশঙ্কা কি শুধুমাত্র উপযোগ নীতির ব্যাপারেই প্রযোজ্য? নৈতিক বাধ্যতাবোধ যে মনের বাইরে অন্য কোথাও অবস্থান করছে সেই বিশ্বাস

কি সেই অনুভূতিকে ভুলে যাওয়ার পথে অধিকতর শক্তিশালী বাধার সৃষ্টি করে? এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যাদি কিন্তু যথার্থই বিপরীতধর্মী। সকল নীতিবিদই স্বীকার করেন ও এই নিয়ে বিলাপও করেন যে সাধারণভাবে সকলের মনেই বিবেককে অতি সহজেই নিশ্চুপ করে দেয়া যায়। উপযোগবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিদের মতো যারা এই মতবাদের সাথে মোটেও পরিচিত নয় তারাও "আমার বিবেকের নির্দেশকে কি আমার পক্ষে মেনে চলা প্রয়োজন?" এই প্রশ্নটি একইভাবে প্রায়শ উত্থাপন করে থাকে। তবে যাদের বিবেক এতই দুর্বল যে তারা এই ধরনের প্রশ্ন উত্থাপন করতে রাজী হবে এবং প্রশ্নটির ইতিবাচক উত্তরে সন্তুষ্ট হবে, তারা অতিপ্রাকৃত মতবাদে বিশ্বাসী বলে তেমনটি করে না, তারা বাহ্যিক অনুমোদনে বিশ্বাসী বলেই এমন কাজ করতে সক্ষম হয়।

এই যে কর্তব্যের অনুভূতি এটা জন্মগত না আরোপিত এখনকার মতো এ নিয়ে কোন সিদ্ধান্তে আসার প্রয়োজন নাই। ধরে নেয়া যাক এটা একটা জন্মগত অনুভূতি। তবুও কিন্তু কিসের সাথে এই অনুভূতি নিজেকে জড়িত করেছে এই প্রশ্নটি একটি খোলা প্রশ্নই থেকে যাচ্ছে। কারণ এই অভিমতের দার্শনিক সমর্থনকারীরাও বর্তমানে নৈতিকতার মূলনীতির স্বজ্ঞীয় প্রত্যক্ষণের (intuitive perception) বিষয়টিকে স্বীকার করে নিয়েছেন, যদিও এই নীতির বিশদ বর্ণনাটিকে তেমন বলে তাঁরা মেনে নেন নি। যদি এই বিষয়টি বিন্দুমাত্র জন্মগত হয়েও থাকে তবে, আমার মতে, এই জন্মগত অনুভূতিটি অন্যদের আনন্দ বা বেদনার সাথে জড়িত না হতে পারার কোন কারণ নেই। আমার পক্ষে এ কথাই বলা উচিত হবে যে, যদি কোন নৈতিকতার মূলনীতি স্বজ্ঞীয়ভাবে বাধ্যবাধকতামূলক হয়ে থাকে তবে এই নীতিটিই হবে সেই নীতি। আর তাই যদি হয় তবে সজ্ঞাবাদী নীতিবিদ্যা ও উপযোগবাদী নীতিবিদ্যা এই দিক দিয়ে সদৃশ, এবং এমন অবস্থায় এগুলোর মধ্যে আর কোন বিবাদই থাকছে না। এমন অবশ্য দেখাই যায় যে, সজ্ঞাবাদী নীতিবিদগণ যদিও মনে করেন নৈতিক কর্তব্যবোধ স্বজ্ঞীয়, তবুও তাঁরা একটি বিষয়কে বিবাদহীন বলে মেনে নিয়েছেন। কারণ তাঁরা সকলেই একমত যে আমাদের সহসৃষ্টির স্বার্থের বিবেচনাই আমাদের নৈতিকতাকে বৃহৎ অংশে প্রভাবিত করে থাকে। সুতরাং যদি নৈতিক কর্তব্যবোধের অতিপ্রাকৃত উৎসে বিশ্বাস অন্তঃস্থ অনুমোদনের উপর কোন রূপ অতিরিক্ত ফলপ্রসূতা প্রদর্শন করে থাকে তবুও কিন্তু, আমার মতে, উপযোগ নীতিটি ইতিমধ্যেই এই তথ্য দ্বারা উপকৃতই হয়েছে।

অন্যদিকে, আমি যেমনটি বিশ্বাস করি, যদি নৈতিক অনুভূতিটি জন্মগত না হয়ে অর্জিত হয়ে থাকে তবেও কিন্তু সেগুলো কোনক্রমেও কম প্রকৃতিগত

BanglaBook.org

হবে না। মানুষের জন্য এটা প্রকৃতিগত বিষয়ই যে সে কথা বলে, সে বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে, নগর তৈরী করে এবং জমি চাষ করে, যদিও এই সকলগুলোই তার অর্জিত কার্যক্ষমতা বা শক্তি (faculties)। তবে নৈতিক অনুভূতি এই অর্থে আমাদের প্রকৃতির অংশ বিশেষ নয় যে-অর্থে এগুলো আমাদের সকলের মধ্যেই কোন একটি প্রত্যক্ষণযোগ্য মাত্রায় প্রদর্শিত হওয়ার কথা। কিন্তু দুঃখের সাথে হলেও বলতে হয় যে অতিপ্রাকৃত উৎসে বিশ্বাসীদের ক্ষেত্রেও যে এ-তথ্যটি প্রযোজ্য সেটা স্বীকার করতেই হয়। উপরে যে-সকল অর্জিত ক্ষমতার কথা বলা হয়েছে সেইগুলোর মত নৈতিক ক্ষমতা যদি আমাদের প্রকৃতির অংশবিশেষ না হয়, তবুও আমাদের প্রকৃতি থেকেই সেটার জন্য, সেইগুলোর মতই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই উৎসারিত হতে সক্ষম এবং চর্চার মাধ্যমে অতি উচ্চমাত্রায় উন্নতিপ্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনাসম্পন্ন। দুঃখের সাথে একথাও স্বীকার করতে হয় যে, বাহ্যিক অনুমোদনের সর্বশ্রেষ্ট প্রয়োগের মাধ্যমে এবং পূর্ববর্তী ইন্দ্রিয়জ অভিজ্ঞতানির্ভর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এই ক্ষমতা প্রায় সকল দিকেই যে পরিচালিত হতে পারে তেমন সম্ভাবনা রয়েছে। এইভাবে এই সকল প্রভাবের ফলে এই ক্ষমতা মানব মনে বিবেকের কর্তৃত্বকে পর্যন্ত হার মানিয়ে মানুষকে যে-কোন আজগুবে বা দুষ্ট লক্ষ্যের প্রতিই চালিত করতে পারে। যদি মানুষের মধ্যে এই সুপ্ত ক্ষমতা (potency) প্রকৃতিগত না হয়েও থাকে তবুও উপযোগ নীতিটিতে যে এই একই সুপ্ত ক্ষমতা কাজ করতে পারে সেই সম্বন্ধে সন্দেহ পোষণ করলে আমাদের পক্ষে সকল অভিজ্ঞতাকে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত না করার মতই হবে।

তবে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট নৈতিক অনুষঙ্গ (association) নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা চলতে থাকলে বিশ্লেষণের পৃথকীকরণ শক্তি দ্বারা সেটা পরাজিত হয়। আবার কর্তব্যের অনুভূতি যদি উপযোগিতার সাথে যুক্ত হয় তবেও এই যুক্ত হওয়াকে সমভাবেই কৃত্রিম ও স্বেচ্ছাচারী বলে মনে হতে পারে। যদি আমাদের প্রকৃতির মধ্যে কোন একটি তেমন নেতৃস্থানীয় বিভাগ না থাকে, যদি কোন শক্তিশালী অনুভূতিকে নিয়ে একটি শ্রেণী গঠিত না হয়ে থাকে যার মধ্যে এই অনুষঙ্গ ঐকতানিক হতে পারে এবং যার দ্বারা আমরা এই অনুভূতিকে অনুধাবন করতে পারি এবং এইভাবে শুধু অন্যের মধ্যেই নয় এই অনুভূতিকে আমাদের নিজেদের মধ্যেও লালন করার প্রতি প্রবণ হতে পারি (অন্যের মধ্যে এই অনুভূতিকে লালন করার পেছনে আমাদের যথেষ্ট স্বার্থপর উদ্দেশ্য থাকতে পারে)—সংক্ষেপে বলা যায়, যদি উপযোগী নৈতিকতার একটি প্রকৃতিগত ভিত্তি থাকে, তবে এমন হওয়াও সম্ভব যে এই অনুষঙ্গকে শিক্ষার মাধ্যমে মানব মনে রোপন করা সম্ভব হলেও সেটাকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে আবার উপড়িয়ে ফেলাও সম্ভব।

BanglaBook.org

তবে শক্তিশালী এই প্রকৃতিগত ভিত্তিস্বরূপ একটি আবেগ রয়েছে। এই হল সেই ভিত্তি যার দ্বারা উপযোগবাদী নৈতিকতার শক্তি গঠিত হয় যখন সর্বসাধারণের আনন্দকে নৈতিক মানদণ্ড বলে চিহ্নিত করা হয়। এই শক্তিশালী ভিত্তিটি হল মানব জাতির সামাজিক অনুভূতি—আমাদের মধ্যে সহসৃষ্টির সাথে একাত্মবোধের কামনা, বা মানব প্রকৃতির মধ্যে ইতিমধ্যেই একটি শক্তিশালী নীতি রূপে নিহিত হয়ে আছে। সুখের বিষয় হল এই যে, এইটা স্পষ্টত বারবার প্রতীয়মান না হলেও সভ্যতার অগ্রগতির প্রভাবের সাথে যে-সকল অনুভূতি অধিক থেকে অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছে এটা তেমন অনুভূতিগুলোর অন্যতম। মানুষের মধ্যে এই যে সামাজিক অবস্থা এটা এত বেশী প্রকৃতিগত, প্রয়োজনীয় এবং অভ্যাসগত যে কোন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বা ঐচ্ছিকভাবে এ থেকে নিজেকে এড়াতে না চাইলে, মানুষ কখনও নিজেকে জনসমষ্টির একজন সদস্য ব্যতীত আর কিছু ভাবতে সক্ষম হয় না। এই যে অনুষঙ্গ এটা আবার মানব জাতি বর্বর অবস্থা থেকে যত দূরে সরে আসছে ততই দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠছে। সুতরাং প্রতিটি ব্যক্তির মনে যে অবস্থার মধ্যে সে জন্মগ্রহণ করেছে সেই ধারণার মধ্যে সমাজ গঠনের জন্য আবশ্যক তেমন কোন শর্তের অবস্থান একটি অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়াচ্ছে এবং সে-রকমটাই মানব সত্তার নিয়তির লিখন হয়ে পড়ছে। বর্তমানে মানুষ নিয়ে গর্বিত সমাজ কোনক্রমেই সকল মানুষের স্বার্থকে বিবেচনা করা ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না; অবশ্য এমন উক্তি মনিব ও দাসের সম্পর্কের বিষয়টিকে বাদ দিয়ে করতে হয়। সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের নিয়ে সমাজ গঠন তখনই সম্ভব যখন সকলের স্বার্থকে সমভাবে বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যেহেতু শুধুমাত্র সার্বভৌম শাসক (absoluto monarch) ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিই সভ্যতার প্রতিটি স্তরে সমান বলে বিবেচিত হয় সেহেতু সকলেই সকলের সাথে সহঅবস্থান করতে পারে, এই শর্তটিকে মেনে নিয়েই বাঁচতে হয়। কালের গতিতে এই অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে এই শর্ত মেনে নেয়া নিয়ে অন্য কোন শর্তে স্থিতিশীলভাবে সহঅবস্থান করা সম্ভবপর হচ্ছে না। এইভাবে অন্যদের স্বার্থকে একেবারে বিবেচনাধীন না করেই জীবনযাপন করার সম্ভাব্যতার বিষয়টি মানুষের ধারণার কাঠামো থেকেই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তারা এখন নিজেদেরকে এমন ভেবে নেয়া আবশ্যক বলে মনে করছে যে অন্তত পক্ষে সকল স্থূলতর ক্ষতিকারক কাজ সম্পাদন থেকে বিরত থাকতে হবে, এবং (শুধুমাত্র নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য হলেও) তাদেরকে এই ধরনের ক্ষতিকারক সম্ভাবনার বিরুদ্ধে ক্রমাগত বিরামহীন আপত্তি জানিয়ে যেতে হবে। বর্তমানে মানুষ অপরের সাথে সহযোগিতার বিষয়টির প্রতি সজাগ হয়েছে এবং তাদের কার্যকলাপের উদ্দেশ্য

BanglaBook.org

যে কেবলমাত্র ব্যক্তিগত বিবেচনায় বিবেচ্য না হয়ে সমষ্টিগত বিবেচনায় বিবেচ্য হতে হবে সে-সম্বন্ধেও নিজেদের নিকট প্রস্তাব করতে বাধ্য হচ্ছে (ন্যূনতম হলেও বিবেচনাটি যখন করা হচ্ছে তখনকার মতন)। তারা সহযোগিতা প্রদর্শন করতে সক্ষম হলে তবেই তাদের সকলের উদ্দেশ্যও এক ও অভিন্ন বলে প্রতিপন্ন হতে বাধ্য। তখন তাদের মধ্যে অন্তত ক্ষণস্থায়ীভাবে হলেও এমন এক অনুভূতির জন্ম নেবে যাতে তারা মনে করবে যে অন্য সকলের স্বার্থ তাদের নিজেদেরই স্বার্থ। এই সকল সামাজিক বন্ধন শক্তিশালী হলে এবং সমাজ সুন্দর হয়ে গড়ে উঠতে থাকলে শুধু যে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যবহারিক জীবনে অন্যদের কল্যাণ সম্বন্ধে সক্রিয়ভাবে ব্যক্তিগত মনোযোগ জোরালো রূপে বৃদ্ধি পাবে তাই নয়, বরং সেই ব্যক্তি তার নিজস্ব অনুভূতির সাথে অন্যদের কল্যাণকে অধিক থেকে অধিকতর-ভাবে অভিন্ন বলে মনে করতে থাকবে, ন্যূনতম হলেও অন্তত পক্ষে সে অন্যদের স্বার্থের বিষয়টিকে অধিকতর মাত্রায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তার বিবেচনার অন্তর্ভুক্ত করবে। আমাদের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য ভৌতিক (physical) শর্তের মতই অপরের কল্যাণের বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেয়া তখন সেই ব্যক্তির জন্য স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে। এই অবস্থায় কোন ব্যক্তির মধ্যে এই অনুভূতি যে পরিমাণেই থাকুক-না-কেন সে স্বার্থ ও সমবেদনা এই উভয় শক্তিশালী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই অনুভূতি প্রদর্শনের প্রতি চালিত হতে থাকবে, এবং নিজের সমগ্র শক্তি দ্বারাই অন্যদেরকেও এই দিকে চালিত হতে উৎসাহিত করে তুলবে। এমন কি তার নিজের মধ্যে যদি এই অনুভূতি বিন্দুমাত্রও অবস্থান না করে তেমন অবস্থায়ও সে অন্য যে-কোন ব্যক্তির মতই অন্যদের মধ্যে এই অনুভূতির উপস্থিতি যে থাকা উচিত সে বিষয়ে তীব্র আগ্রহ পোষণ করবে। ফলত, এই অনুভূতির ক্ষুদ্রতম অনুকণাটিও সংক্রমণ ও শিক্ষার প্রভাবের দ্বারা যত্নের সাথে প্রতিপালিত হয়ে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। উপরন্তু, শক্তিশালী বাহ্যিক অনুমোদনের সাহায্যে এই অনুভূতির চারি পার্শ্বে বলকারক অনুষঙ্গের দ্বারা একটি পূর্ণ জালের সৃষ্টি হতে থাকবে। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে আমাদের প্রকৃতি এবং মানব জীবন সম্বন্ধে ধারণাকে অনুধাবন করার পদ্ধতিটি এইভাবে অধিক হতে অধিকতর প্রকৃতিগত বলে অনুভূত হতে থাকবে। রাজনৈতিক প্রগতি সাধনে স্বার্থের দ্বন্দ্বের উৎসকে সরিয়ে দিয়ে এবং শ্রেণীর ও ব্যক্তির জন্যে আইনগত সুযোগের অসমতাকে দূরীভূত করে দিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপই এইভাবে মানব জাতিকে এই অবস্থা বাস্তবায়নের পথেই এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সকল অসমতার কারণেই মানব জাতির একটি বৃহৎ অংশের আনন্দকে বিবেচনাভুক্ত করার আবশ্যকীয়তার বিষয়টি সম্বন্ধে আজও পর্যন্ত বিস্মৃত হয়ে থাকা সম্ভব হয়েছিল। মানুষের

BanglaBook.org

মনের এই উন্নত পর্যায়ে প্রতিটি ব্যক্তির মধ্যে মানব জাতির সকলের সাথে একাত্মতার সম্বন্ধটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকছে। এইভাবে এই বোধটি ধীরে ধীরে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে কোন ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য কোন উপকারের প্রত্যাশা বা কামনা পর্যন্ত করতে সক্ষম হবে না, যে-প্রত্যাশার মধ্যে অন্য সকলের উপকারকে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। আমার মতে, প্রতিটি ব্যক্তিকে শৈশব অবস্থা থেকে এই একাত্মবোধ দ্বারা তত্ত্বগত ও প্রায়োগিক এই উভয় দিক দিয়ে সম্পূর্ণরূপে উদ্বুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে যদি আমরা এই একাত্মবোধকে প্রচার করি ও শিক্ষা-পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করি, যেভাবে ধর্মকে শিক্ষার সমগ্র শক্তি নিয়ে সকল প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এবং আমাদের সকলের অভিমতের দিকনির্দেশনার দ্বারা মানব মনে প্রবেশ করানো হয়, তাহলে দেখা যাবে যে সাধারণভাবে সকল ব্যক্তিই এই ধারণাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হবে এবং সেক্ষেত্রে সে এই আনন্দভিত্তিক নৈতিকতার চূড়ান্ত অনুমোদন সম্বন্ধে কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করতে পারবে না। নীতিদর্শনের কোন ছাত্রের নিকট যদি উপরোক্ত বিষয়টি দুর্বোধ্য মনে হয় তবে তাকে আমি মিঃ কঁতের (Comte) দুইটি প্রধান গ্রন্থের দ্বিতীয়টিকে পাঠ করার পরামর্শ দিব। গ্রন্থটির নাম হল ***Traite de Politque Positive***। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিদর্শন সম্বন্ধীয় যে-ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করা হয়েছে সে-বিষয়ে আমি ব্যক্তিগতভাবে গুরুতর আপত্তি পোষণ করি। তবে আমার মতেও এই ব্যবস্থা, ঈশ্বরে বিশ্বাসের সাহায্য না নিয়ে ও সেই বিশ্বাসের মানসিক শক্তি ও ধর্মের ফলপ্রসূতার সাহায্য না নিয়েই, মানবতার সেবায় অতিশয় উৎসাহের সাথে সাহায্যের হস্ত বাড়িয়ে দেবার সম্ভাবনার পথ দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এইভাবে মানব জাতিকে মানুষের জীবন, চিন্তা-জগৎ, চরিত্র, অনুভূতি এবং কার্যকলাপ সম্বন্ধে এমন এক আলোক-বর্তিকা দেখাতে সক্ষম হয়েছে যার তুলনায় যে-কোন ধর্মের প্রভাবকে বিবেচনা করলে অতি ক্ষুদ্র ও পর্যাস্বাদন বলে মনে হতে বাধ্য। ধর্মীয় প্রভাবকে শুধুমাত্র যে যথেষ্ট নয় বলে মনে হবে তা নয়, এই বিবেচনায় ধর্ম ব্যক্তির স্বাধীনতা ও ব্যক্তিসত্তার উপর অতিরিক্ত বাধা-বিপত্তি সৃষ্টি করছে বলেও মনে হবে।

যারা উপলব্ধি করতে সক্ষম যে সামাজিক প্রভাব সমগ্র মানব জাতিকে কর্তব্যবোধে জাগ্রত না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে, তাদের মনে উপযোগ নৈতিকতার বন্ধনশক্তির অনুভূতিকে জাগ্রত করার জন্য এই ধরনের ধর্মীয় প্রভাবের কোন প্রয়োজন নেই। বর্তমানে মানব সভ্যতার অগ্রগতির প্রেক্ষিতে যে-তুলনামূলক প্রাথমিক স্তরে আমরা বাস করছি, সেই স্তরে কোন ব্যক্তির পক্ষে বাধ্যভাবে অন্য সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ সহানুভূতি অনুভব করা সম্ভব নয়, যে-ধরনের সহানুভূতির অনুভূতি তাদের জীবনযাপনের মধ্যে সাত্যিকারের ছন্দপতন ঘটাকে অসম্ভব করে তুলবে। তবে

BanglaBook.org

যে-ব্যক্তির মধ্যে ইতিমধ্যেই সামাজিক অনুভূতির দানা বেঁধে গেছে তার পক্ষে এমন মনে করাও সম্ভব নয় যে অন্যান্য সহস্বষ্টিরা শুধুমাত্র আনন্দ অর্জনের পথে তার সাধনার প্রতিদ্বন্দ্বী মাত্র, সে নিজে যেন জীবনে আনন্দ অর্জনে সফল হতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সে অন্য সহস্বষ্টিদের পরাজয় বা ব্যর্থতা কামনা করতেই বাধ্য। বর্তমান অবস্থাতেও প্রতিটি স্বতন্ত্র ব্যক্তির মনে সুদৃঢ় শিকড়-গাঁথা এমন একটি ধারণা অবস্থান করছে যে-ধারণা অনুসারে সে নিজেই এমন একজন সামাজিক প্রাণী যার মধ্যে তেমন বিশ্বাস করার প্রতি প্রবণতা রয়েছে যে তার নিজস্ব উদ্দেশ্য ও অনুভূতি এবং তার সহস্বষ্টির উদ্দেশ্য ও অনুভূতির মধ্যে একটি ঐকতান অবস্থান করছে। যে-অবস্থায় মতের বৈষম্য বা মানসিক সংস্কৃতির বৈষম্য তার জন্য সহস্বষ্টিদের সাথে তাদের বাস্তব অনুভূতিকে অনুভব করা অসম্ভব করে তোলে—তাকে হয়ত বা সেই সকল অনুভূতিকে বর্জন করতে বা অস্বীকার করতে বাধ্য করে—সে-অবস্থায়ও তাকে এই বিষয়ে সচেতন হতে হবে যে তার যথার্থ উদ্দেশ্যের সাথে তাদের উদ্দেশ্যের কোন প্রকারের সতিকারের বিরোধ নেই। তাকে বুঝতে হবে যে অন্যরা যেটা যথার্থই বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে সে সেটা বাস্তবায়নের বিপক্ষে থাকছে না, যথা, তাদের সকলের কল্যাণ। বরং, অপর পক্ষে, সে নিজেই সেই বাস্তবায়নের সহায়ক হচ্ছে। এই যে অনুভূতি এটা অধিকাংশ ব্যক্তির মধ্যে স্বার্থ-প্রণোদিত অনুভূতির প্রভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং প্রায়শই একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। তবে যারা এই অনুভূতির অধিকারী তাদের মধ্যে এই অনুভূতির চরিত্র একেবারেই স্বভাবজাত। তাদের মনে এই অনুভূতির উপস্থিতি শিক্ষার কুসংস্কার রূপে অবস্থান করে না। অথবা এটা সমাজের শক্তির একনায়কত্বের দ্বারা প্রযোজ্য কোন আইনও নয়। বরং এই অনুভূতি এমন একটি গুণরূপে তাদের মধ্যে অবস্থান করে যেই গুণটির অনুপস্থিতি তাদের জন্য শুভ নয়। এই বিশ্বাসটিই হল অধিকতম আনন্দ নৈতিকতার চূড়ান্ত অনুমোদন। এইটিই হল সেই অনুভূতি যার দ্বারা সুন্দরভাবে তৈরী অনুভূতিসম্পন্ন যে-কোন মনকে অপরের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে চলার প্রতি সহায়ক করে তোলে। তখন আর সে অপরের কল্যাণের বিপক্ষে যেতে সক্ষম হয় না। আর যখন ঐ সকল অনুমোদন অনুপস্থিত থাকে বা বিপরীত পথে ক্রিয়াশীল হয়ে পড়ে, তখন এই অবস্থাটিও একটি শক্তিশালী অন্তঃস্থ বন্ধনী শক্তিতে পরিণত হয়। এই বন্ধনী শক্তির মাত্রা অল্প বা বেশী হয় ব্যক্তিবিশেষের চারিত্রিক অনুভূতিপ্রবণতা ও চিন্তাশীলতার মাত্রা অনুসারে। কারণ অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই আছে যাদের মনে নৈতিকতার ক্ষেত্রে শূন্যতা বিরাজ করছে; এবং তারা ছাড়া আর কেউই কখনও অপরের কল্যাণের প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে শুধুমাত্র স্বার্থসিদ্ধির কথা চিন্তা করতে পারে না।

BanglaBook.org

## চতুর্থ অধ্যায়

# উপযোগ নীতির সপক্ষে কি ধরনের প্রমাণ উপস্থাপন সম্ভব

ইতিমধ্যেই মন্তব্য করা হয়েছে যে চূড়ান্ত বা পরম উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন মোটেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ সাপেক্ষ নয়, অবশ্য 'প্রমাণ' শব্দটির সাধারণ ভাবে স্বীকৃত অর্থে। সকল মৌলিক বা প্রাথমিক নীতিমালার (first principles) ক্ষেত্রেই যুক্তি প্রদর্শনে প্রমাণ করার বিষয়ে অযোগ্য হওয়াটা একটি সাধারণ ব্যাপার। আমাদের জ্ঞান-সংক্রান্ত প্রাথমিক পূর্বানুমানের ক্ষেত্রে যেমন তেমনই আমাদের আচরণসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও সেই একই অবস্থা বিরাজ করছে। প্রথমটি [জ্ঞানসংক্রান্ত] নিজে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কীয় বিষয় বলে বাস্তব বিচার করতে সক্ষম যে ক্ষমতাসমূহ সেইগুলোর প্রতি প্রত্যক্ষ আবেদনের বিষয়বস্তু বলে গণ্য হতে পারে—যেমন আমাদের সংবেদন ও আমাদের অন্তঃস্থ বিবেক। ব্যবহারিক উদ্দেশ্যাবলী সম্বন্ধীয় প্রশ্নের উত্তরের জন্যও কি সেই একই ক্ষমতাসমূহের প্রতি আবেদন করা যায় না? অথবা আর অন্য কোন কোন উপায়ে এই সকল বিষয় সম্বন্ধে জানা সম্ভব হতে পারে?

উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্নই হল অন্য কথায় কি জিনিস কাম্য যে-সম্পর্কে প্রশ্ন। উপযোগ মতবাদটি হল এই যে, আনন্দই কাম্য এবং কেবল আনন্দই উদ্দেশ্য রূপে কাম্য। অন্যান্য জিনিস কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যের মাধ্যম রূপেই কাম্য। উপযোগবাদ মতবাদের এই দাবীটিকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে কি কি আবশ্যক — অর্থাৎ কি কি শর্ত এ-মতবাদটির পক্ষে পূরণ করা প্রয়োজন?

একটি জিনিস যে দৃশ্যমান তার একমাত্র যে প্রমাণ দেয়া যায় তা হল, মানুষ বাস্তবিকই তা দেখতে পায়। একটি শব্দ যে শোনা যায়, তার একমাত্র প্রমাণই হল যে মানুষ তা শুনতে পায়। আমাদের অন্যান্য অভিজ্ঞতার উৎস সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। আমার মতে একইভাবে বলা চলে যে কোন জিনিস যে কাম্য, তার এক এবং একমাত্র প্রমাণই হল যে লোকে সত্যি সত্যি তা কামনা করে। যে উদ্দেশ্যটিকে উপযোগ মতবাদ উদ্দেশ্য বলে প্রস্তাব করছে তা যদি বিশ্বাস এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্য হিসাবে স্বীকৃত না হয় তবে কোনক্রমেই কোন ব্যক্তির মনে তাকে উদ্দেশ্য বলে বিশ্বাস জন্মানো সম্ভব নয়। প্রতিটি ব্যক্তি যদি তার নিজের পক্ষে যেটুকু আনন্দ পাওয়া সম্ভব বলে বিশ্বাস করেও তা কামনা

BanglaBook.org

না করে, তবে কেন যে সাধারণ আনন্দ কাম্য হবে তার অনুকূলে কোন যুক্তি প্রদর্শন করাই সম্ভব নয়। যাই হোক, এ-তথ্য অনুযায়ী বলতে হয় যে, আমাদের নিকট সার্বজনীন আনন্দ যে ভাল এই মতের সপক্ষে সবগুলো প্রমাণ যে রয়েছে তা নয়; বরং বলা চলে যে সম্ভবত যে প্রমাণগুলো প্রয়োজনীয় শুধু সেইগুলো আছে: যেহেতু প্রতিটি ব্যক্তির আনন্দ সে ব্যক্তির জন্য ভাল, সেহেতুই সাধারণ আনন্দ জনসাধারণের সমষ্টির জন্য ভাল। আনন্দ যে যথার্থই আচরণের অন্যতম উদ্দেশ্য এই মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, এবং এই প্রতিষ্ঠার ফল হিসাবে আনন্দই নৈতিকতার অন্যতম মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে শুধুমাত্র এর দ্বারাই প্রমাণ হয় না যে আনন্দই হল নৈতিকতার এক এবং একমাত্র মানদণ্ড। একই নিয়ম অনুসরণ করে প্রমাণের কাজটিকে সুচারু রূপে সমাধা করতে হলে আবশ্যিকভাবে প্রদর্শন করতে হবে যে লোকেরা আনন্দকে শুধু কামনাই করে না, তারা একমাত্র আনন্দকেই কামনা করে। এখন এটা সুস্পষ্ট যে লোকেরা সাধারণ ভাষায় আনন্দ থেকে ভিন্ন বলে যে-সব জিনিসকে বুঝায় তেমন জিনিসকেও যথার্থই কামনা করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, লোকেরা সদগুণের উপস্থিতি ও অসদগুণের অনুপস্থিতিকে আনন্দের উপস্থিতি ও বেদনার অনুপস্থিতির চেয়ে কোনক্রমেই কম কামনা করে না। সদগুণকে কামনা করা তেমন সার্বজনীন কিছু নয়, তবে আনন্দকে কামনা করার মতই তা একটি বিশ্বাসযোগ্য তথ্য। সেই কারণেই উপযোগবাদীয় মানদণ্ডের প্রতিপক্ষরা মনে করেন তাদের এমনটি অনুমান করে নেবার অধিকার আছে যে মানব আচরণের উদ্দেশ্য আনন্দ ব্যতীত অন্য অনেক কিছুই হতে পারে, এবং আনন্দই অনুমোদন ও অনুমোদনের একমাত্র মানদন্ড নয়।

কিন্তু উপযোগ নীতি কি অস্বীকার করে যে লোকে সদগুণ কামনা করে, অথবা এই নীতি কি মনে করে যে সদগুণ কামনা করার মত কোন জিনিসই নয়? উপযোগবাদের যথার্থ অর্থে কিন্তু এর বিপরীতটিই করা হয়ে থাকে। উপযোগ নীতি শুধু সদগুণকে যে নিঃস্বার্থভাবে কামনা করা হয় সে তথ্য মেনেই ক্ষান্ত হয় না। বরং এই নীতি অনুযায়ী আরও বলা হয় যে সদগুণকে সবগুণের জন্যই এবং নিঃস্বার্থভাবেই কামনা করা হয়। উপযোগবাদী নীতিবিদগণ সদগুণকে সদগুণ হিসেবে গ্রহণ করার বিষয়ে মূল শর্তাবলী সম্বন্ধে যে-মতই অবলম্বন করে থাকুন-না-কেন, অথবা কার্যকলাপ বা মানসিক বৈশিষ্ট্য সদগুণ হিসেবে গৃহীত হয় শুধুমাত্র সেইগুলো ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার কারণে তাঁরা এই তথ্যে বিশ্বাসী হন-না-কেন (যেমনটা তাঁরা যথার্থই হয়ে থাকেন) তবুও এই তথ্যকে মেনে নেয়ার পরও এবং এ নিয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত

BanglaBook.org

হওয়ার পরও কিন্তু সদগুণধারী ব্যক্তির বর্ণনায় তাঁরা সদগুণকে যে শুধুমাত্র পরম উদ্দেশ্যের পথে মাধ্যম হিসেবে ভাল জিনিসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে আছে তাই মনে করেন না, বরং তাঁরা এমনও মনে করেন যে মানসিক ঘটনা হিসেবে সদগুণ শুধুমাত্র কোন ব্যক্তি বিশেষের মনে একটি উদ্দেশ্য রূপে শুভ কিছুও হতে পারে, সদগুণের উর্ধ্বে অন্য কোন উদ্দেশ্যকে বিবেচনার বহির্ভূত রেখেই। উপযোগবাদী মতবাদ এমনটি মনে করতে পারে যে, একটি মন ঠিক তার স্বস্থানে অবস্থান করতে পারে না বা তেমন অবস্থায় নেই যেমনটি হলে সাধারণ আনন্দের সহায়ক হতে পারে যতক্ষণ পর্যন্ত সেই মনটি সদগুণকে ঠিক একই-ভাবে ভালবাসবে—যদি কোন একটি বিশেষ দৃষ্টান্তে এই সদগুণ অন্যান্য কাম্য ফলাফল উৎপাদন না করে তবুও সদগুণ নিজের জন্য নিজে কাম্য হয়ে ওঠে। তবে সাধারণত সদগুণ কাম্য ফলাফল উৎপাদন করে থাকে এবং এই ফলাফলের কারণেই এই গুণকে সদগুণ বলা হয়। এই অভিমত কোনক্রমেই আনন্দ নীতি থেকে এমন কি স্বল্প পরিমাণেও দূরে সরে যাচ্ছে না। আনন্দের উপাদানগুলো অত্যন্ত বহুল সংখ্যক, এবং প্রতিটিই নিজের জন্যই নিজে কাম্য হয় ও সেইগুলো যখন শুধুমাত্র একত্রিত হয়ে ওঠে তখনই কাম্য হয় না। উপযোগ নীতি অনুযায়ী এমনটা বোঝায় না যে, কোন একটি সুখ, যেমন গান বাজনা শোনার সুখ, অথবা কোন একটি বেদনার অনুপস্থিতি, যেমন স্বাস্থ্যবান থাকা, প্রভৃতিকে নানা উপাদান-সম্বলিত আনন্দ বলতে যা বোঝায় তেমন কিছুকে বাস্তবায়নের উপায় হিসেবেই কাম্য মনে করা হয় এবং শুধু সেই জন্যই সেগুলো কাম্য হয়। এগুলো যথার্থই নিজেদের মধ্যে এবং নিজেদের জন্যই কাম্য। এগুলো উপায় হয়েও আবার উদ্দেশ্যের অংশবিশেষও বটে। উপযোগবাদীয় নীতি অনুযায়ী সদগুণ প্রাকৃতিকভাবে বা স্বাভাবিকভাবে এবং উৎপত্তিগতভাবে উদ্দেশ্যের অংশবিশেষ নয়। কিন্তু সদগুণের জন্য তেমনটি হবার সম্ভাবনা আছে। যারা কোন উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য সদগুণসম্বলিত জীবন যাপন করে না তাদের জন্য সদগুণ উদ্দেশ্যের অংশ-বিশেষ হতে পারে এবং তা কাম্য ও আকাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে আনন্দকে বাস্তবায়নের উপায় রূপে নয়, বরং আনন্দের অংশ রূপেই।

এই বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করতে হলে বলতে হয়, আমাদের পক্ষে মনে রাখা প্রয়োজন যে সদগুণই একমাত্র তেমন কিছু নয় যার উপায় হিসেবেই প্রাথমিকভাবে উৎপত্তি ঘটেছে, এবং যদি অন্য কোন কিছু বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে গণ্য না হত তবুও সেটা নিরপেক্ষ কিছু কিন্তু হত না, অথবা সেটা কোন কিছুকে বাস্তবায়িত করার উপায়রূপে ব্যবহৃত হলেও নিজের জন্য নিজে কাম্য হয়ে উঠতে পারে এবং অত্যন্ত গভীরভাবেই তেমনটা হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অর্থের মোহকে আমরা কি বলবো? প্রাথমিক স্তরে চকচকে নুড়ির বা চাকার প্রতি কাম্যতার চেয়ে অর্থের প্রতি কাম্যতা কোন অংশেই অধিক ছিল না। অর্থের দ্বারা যে-সকল জিনিস ক্রয় করা যায় অর্থের মূল্য সেইগুলোর উপরই নির্ভরশীল। এই অবস্থায় অন্যান্য জিনিসই কাম্য হয়ে থাকে আর অর্থ শুধু সেইগুলো আহরণের উপায় থাকে মাত্র। তবুও অর্থের মোহ মানব জীবনের একটি অন্যতম নির্ণায়ক শক্তি বলে গণ্য হয় না। তবে অনেক সময় অর্থকে আবার নিজের মধ্যেই এবং নিজের জন্য কামনা করা হয়, এবং তখন অর্থের জন্য অর্থকে কামনা করার বিষয়টিই অধিকতর প্রধান হয়ে ওঠে। অর্থকে ব্যবহার করাটা তখন আর প্রাধান্য পায় না। তখন ধীরে ধীরে অন্যান্য কামনাগুলো হ্রাস পায় এবং অর্থকে ব্যবহার করার চেয়ে অর্থের জন্যই অর্থকে কামনা করার প্রতি প্রবণতা বৃদ্ধি পায়। সেই সময় অর্থকে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কামনা করা হয় না, শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের অংশ হিসাবে কামনা করা হয়। আনন্দের উপায় থেকে এইভাবে অর্থ ব্যক্তিবিশেষের আনন্দ সম্বন্ধে ধারণার একটি প্রধান উপাদান রূপে গণ্য হয়। মানব জীবনের সাথে সম্বন্ধযুক্ত অধিকাংশ দ্রব্য সম্বন্ধেই এই একই কথা বলা চলে, যেমন ক্ষমতা অথবা খ্যাতি সম্বন্ধে। যদিও ক্ষমতা ও খ্যাতির সাথে আনন্দ পাওয়ার মত একটা কিছু স্বভাবগতভাবেই সম্পৃক্ত রয়েছে বলে অন্তত তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয়, যেমনটা অর্থের নিজের মধ্যে আছে বলে মনে হয় না। সে যাই হোক, ক্ষমতা ও খ্যাতি লাভের প্রতি অত্যন্ত জোরালো স্বাভাবিক আকর্ষণ আমাদের অন্যান্য ইচ্ছা পূরণের জন্য অত্যন্ত শক্তিশালী সহায়ক শক্তি হয়ে থাকে। এইভাবে এগুলোর সাথে আমাদের অন্যান্য কাম্য জিনিসের একটি জোরালো অনুষঙ্গ আছে বলে মনে করা হয় এবং এই কারণেই এই স্বভাবগত আকর্ষণগুলোকে অন্যান্য কাম্য জিনিসের তুলনায় অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়। এইভাবে এই ধরনের অবস্থায় উপায়ই বা মাধ্যমই আবার উদ্দেশ্যের অংশ হয়ে দাঁড়ায়, এবং এমন কি যে-সব জিনিস বাস্তবায়নের উপায় হিসেবে সেগুলো ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলো থেকে উপায়গুলোই অধিক গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ হয়ে যায়। এক সময়ে যা কিনা আনন্দকে বাস্তবায়নের উপায়স্বরূপ একটি পদ্ধতি রূপে ব্যবহৃত হয়েছে সেটাই আবার নিজের জন্যই নিজে কাম্য হয়ে উঠে। সে যাই হোক, এইভাবে নিজের মধ্যে নিজে কাম্য হওয়ার মাধ্যমেই সেটা আনন্দের অংশ হিসেবেই কাম্য হয়ে উঠে। তখন কেবলমাত্র এই কাম্য জিনিসটিকে পেলেই কেউ আনন্দিত হতে পারে বা মনে করা যেতে পারে যে সেই উপায়েই কেউ আনন্দিত হতে পারে, বা পেতে সক্ষম না হলে সে আনন্দবিহীন হতে পারে। তবে এই যে এমন

BanglaBook.org

জিনিসকে কামনা করা, যথা, গান-বাজনার সুখকে কামনা করা, বা স্বাস্থ্যকে কামনা করা, আনন্দকে কামনা করার চেয়ে ভিন্ন কিছু নয়। এগুলোর সবই কিন্তু আনন্দের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এগুলো আনন্দের কাম্যতাকে সৃষ্টি করার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলো উপাদান মাত্র। আনন্দ কোন একটি বিমূর্ত ধারণা নয়; এটা একটি মূর্ত সমগ্র; এবং এইগুলো সেই মূর্ত সমগ্রেরই অংশবিশেষ। উপযোগবাদীয় মানদণ্ড এইভাবেই এগুলোকে অনুমোদন করে এবং এগুলোর স্বীকৃতি দেয়। আমাদের জীবন একেবারে শুষ্ক-বিস্বাদ হয়ে পড়ত এবং আনন্দের উৎসের অভাব ঘটত, যদি না প্রকৃতির মধ্যে যে-সকল জিনিস প্রাথমিকভাবে লক্ষ্যযোগ্য নয় অথচ আমাদের আদিম কাম্যতার জন্য সহায়ক অথবা অন্য কোনভাবে সেইগুলোর সাথে সম্পৃক্ত, সে-সকল জিনিস নিজেদের মধ্যেই সুখের উৎস না হয়ে উঠত। সে-রকম না হলে যথার্থই মানব অস্তিত্বের কালিক প্রবাহের বিচারে স্থিতিশীলতার দিক থেকে এবং তীব্রতার দিক থেকেও মানব জীবন শুষ্ক মরুভূমিতে পরিণত হয়ে পড়ত।

উপযোগবাদী ধারণা অনুযায়ী সদগুণ এই ধরনেরই একটি বর্ণনা। এই গুণটির জন্য কোন প্রাথমিক কাম্যতা থাকে না, অথবা অভীপ্সাও থাকে না। শুধুমাত্র আনন্দকে বাস্তবায়নের সহায়ক হিসাবে এবং বিশেষ করে বেদনাকে এড়ানোর পদ্ধতি হিসেবেই সদগুণকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করা হয়। কিন্তু এইভাবে অনুষঙ্গটি গড়ে উঠেছে বলেই সদগুণকে কালক্রমে নিজের মধ্যেই নিজে ভাল বা স্বগুণেই ভাল বলে প্রতিপন্ন করা হয় এবং অন্য যে-কোন ভাল কিছুর মতই অত্যন্ত তীব্রভাবেই তা কাম্য হয়ে ওঠে। সদগুণের অর্থের মোহ বা ক্ষমতার মোহ বা খ্যাতির মোহের সাথে এই ধরনের পার্থক্য আছে বলেই সদগুণ ব্যতীত অন্য সকলগুলোই ব্যক্তিবিশেষকে সমাজের অন্যান্যদের প্রতি বিযুক্ত করে তুলতে পারে বা প্রায়শই তেমন করে তোলে। সদ্‌গুণের প্রতি স্বার্থহীন অনুরাগ বা আকর্ষণের চর্চা সমাজের মানুষের জন্য যেমন আশীর্বাদ হয়ে ওঠে তেমনটি আর কোন কিছু দ্বারাই সম্ভব নয়। ফলত উপযোগবাদীয় মানদণ্ডে সদগুণের আকর্ষণকে অত্যন্ত উচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করা হয় এবং সদগুণের চর্চাকে যথাসম্ভব শক্তিশালী করতে বলা হয়। এই মানদণ্ড অনুসারে সার্বজনীন আনন্দের জন্য সকল কিছুর মধ্যে সদগুণের চর্চাকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। অন্য দিকে এই মানদণ্ড অন্যান্য অর্জিত কামনাগুলোকে সহ্য করে বা অনুমোদন করে যতক্ষণ না সেইগুলো সাধারণের আনন্দের পরিপন্থী না হয়ে সহায়ক হয়ে থাকে।

BanglaBook.org

উপরের বিবেচনা থেকে এইটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে, বাস্তব অর্থে আনন্দ ব্যতীত আর কিছুই কামনা করা হয় না। অন্য আর যা কিছুকে তার নিজের উর্ধ্বে অন্য কিছুর উপায় হিসেবে, আর চূড়ান্তভাবে আনন্দের উপায় হিসেবে, কামনা না করে অন্য কোন কারণে কামনা করা হয়, সেগুলোকে তখন নিশ্চয়ই আনন্দের অংশ রূপেই কামনা করা হয়; এবং যতক্ষণ পর্যন্ত সেইগুলোকে আনন্দের অংশ বলে মনে করা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত সেইগুলোকে তেমনভাবে কামনাই করা হয় না। যখন কেউ সদগুণকে কামনা করে তখন সে নিশ্চয়ই তেমনটি করে সদগুণ একটি আনন্দ এই সচেতনতা নিয়ে, অথবা এটা একটি বেদনা নয় এই সচেতনতা নিয়ে, অথবা এই দুইটির প্রতিটি ভাবনাই সেই ব্যক্তির চেতনে বিরাজ করে থাকে। কারণ আনন্দ ও বেদনা কদাচিৎই বাস্তব ক্ষেত্রে পৃথকভাবে অবস্থান করেছে। বরং প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তারা সহঅবস্থানই করে থাকে—একই ব্যক্তি যখন কোন একটি বিশেষ পরিমাণের সদগুণ অর্জন করে আনন্দ পায় তখন সেই ব্যক্তি আর বেদনাকে অনুভব করে না। যদি সদগুণ অর্জন তাকে আনন্দ না এনে দেয় বা সদগুণ অর্জন থেকে বিরত থাকা তাকে বেদনা না এনে দেয়, তবে বলতে হবে যে সে ব্যক্তি সদগুণকে ভালবাসে না বা সদগুণ কামনাও করে না; অথবা নিজের বা সে যাদের ভালবাসে তাদের জন্য কোন উপকার আনয়ন করবে সেই মাধ্যম রূপেই সে সদগুণকে কামনা করে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, কি ধরনের প্রমাণ উপযোগ নীতির সপক্ষে দেয়া সম্ভব এই প্রশ্নের উত্তর এবার আমরা পেলাম। যে-অভিমত আমি ইতিমধ্যেই প্রকাশ করেছি তা যদি মনস্তাত্ত্বিকভাবে সত্য হয়—অর্থাৎ যদি মানব প্রকৃতি এমন হয় যে মানুষ যা আনন্দের অংশ বা যা আনন্দের উপায় তাছাড়া অন্য কিছুই কামনা করে না—তবে এগুলোই যে একমাত্র কাম্য জিনিস সে-তথ্য বিনা আর কোন প্রকারের প্রমাণ আমাদের হাতে নেই বা আর কোন প্রমাণের প্রয়োজনও নেই। তাই যদি হয় তবে আনন্দই মানুষের সকল কার্যকলাপের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং আনন্দের বাস্তবায়ন ক্ষমতা নির্ণয়করণই হল সকল মানব কার্যকলাপকে মূল্যায়ন করার একমাত্র অভীক্ষা। এই থেকে একথাই বোঝায় যে এই আনন্দকে বাস্তবায়নই হল নৈতিকতার মাপকাঠি, কারণ একটি অংশ সর্বদাই সমগ্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে।

এখন দেখা যাক যথার্থই তেমনটি কিনা, যথার্থই মানব জাতি নিজেদের জন্য আনন্দদায়ক অথবা বেদনাবিহীন তেমন কিছু ব্যতীত অন্য কিছুকেই কামনা করে কিনা। এই বিবেচনাও অন্যান্য বিবেচনার মতই অভিজ্ঞতা ও তথ্যভিত্তিক হবে,

BanglaBook.org

যা কিনা অবশ্যই প্রত্যক্ষ সঠিক তথ্যের উপর নির্ভরশীল হবে। এই ধরনের সমস্যার উত্তর পেতে হলে অবশ্যই আত্ম-সচেতনা ও আত্ম-পর্যবলোকনের অভ্যাস করতে হবে এবং একই সাথে অন্যদেরকেও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। আমার বিশ্বাস, যদি তথ্যাদির এই উৎসগুলোকে পক্ষপাতহীনভাবে বিবেচনা করা হয় তাহলে এমনটাই প্রতিপন্ন হবে যে কোন জিনিসকে কামনা করা আর সেটাকে আনন্দদায়ক মনে করা, অথবা কোন জিনিস থেকে দূরে থাকা এবং সেটাকে বেদনাদায়ক মনে করা একই ঘটনার দুইটি দিক মাত্র—সহজ ভাষায় বলা চলে যে এগুলো একই মানসিক তথ্যকে দুইটি ভিন্ন ধরনের নামে উল্লেখ করা মাত্র। একটি জিনিসকে কাম্য মনে করা (এটার ফলাফলের জন্য যদি তেমন মনে না করা হয়ে থাকে) এবং সেই একই জিনিসকে আনন্দদায়ক মনে করা এক এবং অভিন্ন ব্যাপার। কোন জিনিসকে আবার যে পরিমাণের সুখদায়ক মনে করা হবে সেই পরিমাণের আনুপাতিক হারেই তাকে কামনা করা হবে না তেমনটি ঘটা একটি মনস্তাত্ত্বিক ও আধিবিদ্যক অসম্ভাব্য বিষয়।

তাই আমার মতে এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে এই বিষয়টি নিয়ে বিশেষ কোন বিরোধ দেখা দিবে না, এবং তেমনটাই আমার বিশ্বাস। এমন আপত্তি উঠতে পারে যে, সুখের উপস্থিতির বা বেদনার অনুপস্থিতির প্রতি কামনাকে চালিত করা যাবে না যে তেমন কিন্তু নয়, তবে এমন বলা যায় যে অভীপ্সা কামনা থেকে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন বিষয়। একথা বলা যায় যে ব্যক্তি যদি দৃঢ় বিশ্বাসে উদ্ভূত হয় অথবা ব্যক্তির উদ্দেশ্য যদি পূর্ব থেকেই স্থির হয়ে থাকে তাহলে তারা সুখের কথা চিন্তা না করেই তাদের কার্যকলাপ স্থিরকৃত উদ্দেশ্য সাধনের প্রতিই চালিত করবে। তাদের চরিত্রগত কোন পরিবর্তনের ফলে বা তাদের নিষ্ক্রিয় বোধশক্তির কারণে অথবা এই স্থিরকৃত উদ্দেশ্য সাধনের পথে বেদনার উপস্থিতির কারণে যদি সুখের অভাবও ঘটে তবুও তারা পূর্বে স্থিরকৃত কার্যকলাপই করে যাবে। এই সকল কিছুই আমি সম্পূর্ণরূপেই স্বীকার করছি এবং আমি নিজে এই সমস্ত কথা অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে এবং সুস্পষ্টভাবে পূর্বেই বলেছি। অভীপ্সা একটি সক্রিয় ক্রিয়াক শক্তি হিসেবে কামনার মত একটি নিষ্ক্রিয় বোধশক্তি থেকে সম্পূর্ণ একটি ভিন্ন জিনিস। যদিও উৎপত্তিগত দিক দিয়ে অভীপ্সা কামনা থেকেই সৃষ্ট তবুও অভীপ্সা কালের ব্যবধানে নিজেকে কামনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে স্বাধীন হয়ে যায়, এবং এতই স্বাধীন হয়ে যায় যে অভ্যাসগত উদ্দেশ্য সাধনের বিষয়ে আমরা উদ্দেশটিকে কামনা করি যেহেতু আমরা সেই রকমই ইচ্ছা করি। যাই হোক, এই ধরনের দৃষ্টান্ত অভ্যাস শক্তির সাথে অত্যন্ত পরিচিত-ভাবেই জড়িত এবং কোনক্রমেই সদগুণসম্বলিত কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ

BanglaBook.org

নয়। বহু প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন কার্যকলাপ আছে যেগুলো প্রাথমিকভাবে মানুষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে সম্পাদন করতে আরম্ভ করে, কিন্তু পরে হয়ত বা অভ্যাসগতভাবেই করে থাকে। কখনও কখনও এই রকমটা সচেতনভাবে ঘটে না, বরং সচেতনতা কার্য সম্পাদনের পরই অনুভূত হয় মাত্র। অন্য সময় হয়ত সচেতন অভীপ্সা শক্তি (Volition) কার্য সম্পাদনে ব্যক্তিকে প্রণোদিত করে, কিন্তু অভীপ্সা শক্তি এখানে অভ্যাসগত হয়ে পড়ে, যেমনটা প্রায়ই দেখা যায় তাদের মধ্যে যারা দুষ্ট অথবা ক্ষতিকারক কার্যকলাপ করার অভ্যাস অর্জন করেছে। তৃতীয় বা শেষ অবস্থায় এমন হয় যে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে অভ্যাসগতভাবে অভীপ্সিত ক্রিয়াকলাপ সাধারণের অভিপ্রেত উদ্দেশ্য সাধনের অন্তরায় না হয়ে বরং সেইগুলো বাস্তবায়নের সহায়ক হয়। তেমনটি দেখা যায় সদগুণসম্বলিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপে এবং যারা একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সচেতনভাবে সক্রিয় রয়েছে তাদের মধ্যে। এইভাবে পার্থক্যটিকে অনুধাবন করলে অভীপ্সা ও কামনার মধ্যে পার্থক্যটিকে একটি সঠিক এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক তথ্য বলে মনে হবে। কিন্তু যথার্থ তথ্য হল এই যে—অভীপ্সা আমাদের গঠনের অন্যান্য অংশের মতই একটি এমন শক্তি যা অভ্যাসের সাথে সাথে চলে, এবং আমরা যে-সকল জিনিস তাদের নিজেদের জন্য কামনা করি না সেইগুলোকেও অভ্যাসগতভাবেই অভীপ্সিত বলে মনে করতে পারি, অথবা যেহেতু আমরা সেইগুলোকে অভীপ্সিত বলে মনে করি সেহেতুই সেইগুলোকে কামনা করি। এটা কম সত্য নয় যে, প্রাথমিকভাবে অভীপ্সা কামনা থেকেই সৃষ্ট, এখানে কামনা পদটিতে নিহিত রয়েছে বেদনা থেকে দূরে থাকার প্রবণতা এবং সুখের প্রতি আকর্ষিত হবার প্রবণতা। যা সঙ্গত তা করার প্রতি দৃঢ় অভীপ্সা আছে তেমন ব্যক্তিকে আমরা বিবেচনা নাই করলাম। এখানে তেমন ব্যক্তিদের নিয়েই আমরা বিবেচনা করব যাদের সেই ধরনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত ক্ষীণ এবং যে-ব্যক্তিদের মন লোভ দ্বারা বিজিত এবং যাদেরকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা যায় না। এই ধরনের ব্যক্তিদের অভীপ্সাকে কি উপায়ে শক্তিশালী ও দৃঢ়তর করা সম্ভব? এই অভীপ্সা যথেষ্ট পরিমাণে অস্তিত্বশীল নেই এমন ব্যক্তির মনে কোন উপায়ে সদ্‌গুণে গুণান্বিত হবার অভীপ্সাকে আরোপ করা বা সুপ্ত অবস্থা থেকে জাগ্রত করা কি সম্ভব? শুধুমাত্র সেই ব্যক্তিকে সদগুণ কামনা করার প্রতি চালিত করা দ্বারাই তেমনটা বাস্তবায়ন সম্ভব—তাকে সুখের সাথে এই গুণটিকে জড়িত করতে এবং এই গুণটির অনুপস্থিতির সাথে বেদনাকে জড়িত করতে শেখানোই হল এই উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। সুখের সাথে সঙ্গত কার্যকলাপের অনুষঙ্গ স্থাপন করে এবং অসঙ্গত কার্যকলাপের সঙ্গে বেদনার অনুষঙ্গ স্থাপন করেই তা সম্ভব, অথবা একটির

BanglaBook.org

সাথে স্বাভাবিকভাবেই সুখ জড়িত রয়েছে এবং অন্যটির সাথে বেদনা জড়িত রয়েছে এই বিষয়টি সম্বন্ধে সেই ব্যক্তিকে তার অভিজ্ঞতার মাধ্যমে বুঝিয়ে তাকে সে বিষয়ে উৎসাহিত করে বা তার মনে সে বিষয়ের প্রতি আগ্রহের সৃষ্টি করেই তেমনটি সম্ভব। এইভাবেই অভীপ্সাকে সদগুণের প্রতি তেমনভাবে চালিত করা সম্ভব যখন সুখ বা বেদনার কথা চিন্তা না করেই কোন ব্যক্তি অভীপ্সিত সদগুণের সাধনা করবে। অভীপ্সা কামনারই সন্তান। তবে এই অভীপ্সা পিতামাতার লালন-পালন থেকে তখনই কেবল স্বাধীন হতে পারে যখন অভীপ্সা এইভাবে অভ্যাসগত হয়ে পড়ে। কিন্তু বা শুধুমাত্র অভ্যাসের ফলাফলমাত্র তাকে অন্তর্নিহিতভাবে ভাল বলা যায় না। তবে এমনটা আশা না করার কোন কারণ থাকতে পারে না যে সদগুণের উদ্দেশ্য সুখ বা বেদনা থেকে স্বাধীন হয়ে উঠতে পারে না। যদিও শুধুমাত্র সুখদায়ক ও বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতার সাথে অনুষঙ্গিত হয়েই সদগুণ নির্ভুলভাবে তার নিজস্ব পথে সর্বদাই ক্রমাগত এগিয়ে যেতে পারে, তবুও কেবলমাত্র সদগুণ যখন অভ্যাসগত হয়ে পড়ে তখনই তেমনটা হওয়া সম্ভব। অনুভূতি এবং চরিত্র এই উভয় ক্ষেত্রেই অভ্যাসই একমাত্র গুণ যা কার্যকলাপের নিশ্চয়তা এনে দিতে সক্ষম। যেহেতু অপরের এবং নিজের অনুভূতি ও চরিত্রের উপর সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস স্থাপন করতে সক্ষম হওয়া একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেহেতুই সঙ্গত কার্য সম্পাদনের অভীপ্সাকে অভ্যাসগতভাবে স্বাধীন করার প্রতি চালিত করা অত্যন্ত আবশ্যক। অন্য কথায় বলতে হয়, অভীপ্সার এই অবস্থাকে মাধ্যম হিসেবে শুভ বলা চলে, কিন্তু অভীপ্সার এই অবস্থাকে অন্তর্নিহিতভাবে ভাল কিছু বলা যায় না। শুধু নিজের মধ্যে সুখদায়ক তেমন কিছু বাস্তবায়ন অথবা সুখ বাস্তবায়নের বেদনা এড়ানো ব্যতীত আর কিছুই মানুষের জন্য উদ্দেশ্য হতে পারে না এই মতবাদের সাথে অভীপ্সা নিজেই যে মাধ্যম হিসাবে শুভ এই অভিমত যে মোটেও বিরোধিতাপূর্ণ নয় তা এই উপায়েই বোঝা সম্ভব।

আবার এই মতবাদটি যদি সত্য হয় তবে উপযোগ নীতিটিও এভাবে প্রমাণিত হয়ে যায়। যথার্থই তেমনটি হয়েছে কিনা সেই বিবেচনা এখন শুধুমাত্র চিন্তাশীল পাঠকের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দিতে হয়।

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

পঞ্চম অধ্যায়

# ন্যায়নীতি ও উপযোগের সম্পর্ক

সর্বকালেই চিন্তাজগতে সঙ্গততা ও অসঙ্গততা মূল্যায়নের মানদণ্ড হিসাবে উপযোগ বা আনন্দ নীতিকে গ্রহণ করার বিরুদ্ধে অন্যতম শক্তিশালী আপত্তি প্রণীত হয়েছে ন্যায়নীতির ধারণা থেকে। এই শব্দটি একটি সহজাত প্রবণতার মত যে-প্রকারের সবল আবেগ এবং আপাত-সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষণকে তাৎক্ষণিকতা ও ও নিশ্চয়তার সাথে জড়িত করে তাতে অধিকাংশ চিন্তাবিদ এটাকে জিনিসের একটি অন্তঃস্থ গুণ বলে মনে করেন। এই জন্য যা ন্যায়পরায়ণ তাকে অবশ্যই একটি পরম কিছু হতে হবে, সেটাকে জাতিগতভাবে সর্বপ্রকার সুবিধাবাদী অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন হতে হবে, এবং ধারণাগতভাবে সুবিধাবাদী অবস্থার বিপরীত কিছু হতে হবে, যদিও (যেমনটি সাধারণত স্বীকার্য) বাস্তব অবস্থায় সুবিধাবাদ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হবে না।

আমাদের অন্যান্য নৈতিক আবেগের বিষয় নিয়ে যেমন হয় ঠিক তেমনটিই এই ন্যায়নীতির বিষয়টিতেও হয়: ন্যায়নীতির উৎসের প্রশ্নটি ন্যায়নীতিকে মেনে চলার শর্তাবদ্ধ করার বন্ধন শক্তির প্রশ্নের সাথে আবশ্যিকভাবে জড়িত নয়। কোন একটি অনুভূতি প্রকৃতিগতভাবে আমাদের মধ্যে এসেছে বলেই যে সেই অনুভূতি দ্বারা আমাদেরকে চালিত হতে হবে তা আবশ্যিকভাবে স্বীকার করা যায় না। ন্যায়নীতির অনুভূতি হয়ত আমাদের অন্যান্য প্রবণতার মতই একটি বিশেষ প্রবণতা, যে-প্রবণতার জন্য উচ্চতর ধীশক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া এবং সুস্পষ্টতর হওয়া প্রয়োজন। আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা আমাদেরকে একটি বিশেষ ধরনের বিবেচনার প্রতি চালিত করে যেমন আমাদের জীববৃত্তিক প্রবণতা আমাদেরকে একটি বিশেষ উপায়ে ক্রিয়াশীল করে তোলে। কিন্তু তাই বলে এমন কোন আবশ্যিকতা নেই যে দ্বিতীয়টি যেমন তার ক্ষেত্রে হবে তার তুলনায় প্রথমটি তার ক্ষেত্রে সর্বদাই অধিকতর নির্ভুল বলে প্রতিপন্ন হবে। এমনও হওয়া সম্ভব যে প্রথমটি দ্বারা ভুল বিবেচনাকে সামনে তুলে ধরা হচ্ছে আর দ্বিতীয়টি দ্বারা ভুল ক্রিয়া করতে চালিত করা হচ্ছে। তবে যদিও আমাদের ন্যায়নীতির প্রতি স্বাভাবিক অনুভূতি বা আবেগ আছে বলে আমাদের মনে বিশ্বাস থাকা এক কথা এবং সেই অনুভূতিকে চরিত্র মূল্যায়নে একটি চূড়ান্ত মাপকাঠি বলে স্বীকার করে নেয়া

BanglaBook.org

ভিন্ন কথা, তবুও একটি ক্ষেত্রে এই দুইটি বিষয় অতি নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত। মানব জাতি সর্বদাই এমন বিশ্বাস করতে প্রবণ যে কোন একটি ব্যক্তিনির্ভর অনুভূতি সর্বদাই একটি বস্তুনির্ভর সত্তার প্রকাশ মাত্র, যদি সেই অনুভূতিকে অন্য কোন প্রকারে ব্যাখ্যা করা সম্ভব না হয়। এখনকার মত আমাদের উদ্দেশ্য হল এই তথ্য নির্ধারণ করা যে, ন্যায়নীতির অনুভূতি যে-সত্তার সাথে জড়িত সেই সত্তার এই ধরনের বিশেষ প্রকাশের প্রয়োজন আছে কি না, একটি কাজের ন্যায়ত্ব ও অন্যায়ত্ব সেই কাজের অন্যান্য গুণাগুণ থেকে অন্তর্নিহিতভাবে বিশেষ এবং ভিন্ন কিনা অথবা এটা একটি বিশেষ অবস্থার মধ্যে অবস্থিত শুধুমাত্র ঐ সকল কিছু কিছু গুণাগুণের সংমিশ্রণ কিনা। এই অন্বেষণ সাধনের উদ্দেশ্যে আমাদের জন্য এই তথ্যটি নির্ণয় করা আবশ্যক যে ন্যায় অন্যায়ের অনুভূতি নিজেই আমাদের রঙ ও স্বাদের সংবেদনের মত স্বয়ংভূ (*Sui generi*) কি না, না কি এই অনুভূতিগুলো অন্যান্য অনুভূতির সংমিশ্রণে সৃষ্ট। এই পরীক্ষণ হল অধিকতর প্রয়োজনীয়, কারণ সাধারণ সুবিধার ক্ষেত্রের একাংশের সাথে ন্যায়নীতির নির্দেশ যে বস্তুনির্ভরভাবে অনুরূপ হয় সে-তথ্য লোকেরা সাধারণভাবে মেনে নিতে রাজীই আছে। কিন্তু যখনই সরল সুবিধাবাদকে এমন এবং ন্যায়নীতির ধারণার সাথে যুক্ত করা হয় যা ন্যায়নীতির ব্যক্তিনির্ভর মানসিক অনুভূতির ধারণার থেকে ভিন্ন, তখনই লোকেরা ন্যায়নীতিকে কেবলমাত্র একটি বিশেষ ধরনের উপযোগ বা উপযোগের একটি বিশেষ শাখা রূপে মেনে নিতে পারে না, এবং মনে করে যে ন্যায়নীতির উৎকৃষ্টতর শর্তাবদ্ধ করার বন্ধন শক্তির জন্য একে একটি ভিন্ন উৎস থেকে সৃষ্ট হতে হয়েছে। যখন ন্যায়নীতিকে সাধারণ সুবিধার সাথে সংযুক্ত আছে বলে মেনে না নিয়ে আর কোন উপায় থাকে না তখনই কেবলমাত্র লোকেরা সেই ধরনের চরম অবস্থায় তেমনটা মেনে নিতে বাধ্য হয়।

এই প্রশ্নটি নিয়ে আলোকপাত করতে হলে ন্যায়নীতির বা অন্যায়নীতির কি কি বিশেষ পৃথকীকরণের ক্ষমতাসম্পন্ন চরিত্র রয়েছে সেটা নির্ণয় করা আবশ্যক। এটা এমন একটি কি ধরনের গুণ, বা এমন কোন বিশেষ গুণ আছে কি সেটা নির্ণয় করতে হয় যে-গুণ সাধারণভাবে সকল অন্যান্য ধরনের কার্যকলাপের মধ্যে অবস্থান করছে (কারণ প্রায় সকল অন্য নৈতিক গুণাবলীর মত ন্যায়নীতিও বিপরীত পদ দ্বারাই সর্বাধিক উত্তম উপায়ে প্রজ্ঞায়িত হয়ে থাকে)। যেগুলোকে অনুমোদন করা হয় না তবে প্রকাশ্যভাবে যেগুলোকে অনুমোদন-অযোগ্য বলে ঘোষণাও করা হয় না সে-রকম অন্যান্য কার্যকলাপ থেকে এই অন্যায় বলে গণ্য কার্যকলাপের পার্থক্য নির্ণয় করাও আবশ্যক। লোকেরা যে-সকল কার্যকলাপকে ন্যায় বা অন্যায় বলে গ্রহণ করতে অভ্যস্ত সেইগুলোর মধ্যে

BanglaBook.org

যদি কোন সাধারণ গুণ বা গুণাবলীর সংমিশ্রণকে আমরা সর্বদাই অবস্থান করতে দেখি, তবে আমাদের পক্ষে এই বিবেচনায় অগ্রসর হওয়া সঙ্গত হবে যে এই সকল বিশেষ গুণ বা গুণাবলীর সংমিশ্রণ যথার্থই এইগুলোর সাথে একটি বিশেষ চরিত্রের আবেগকে জড়িত করছে কি না, বা আমাদের আবেগের জগতের সাধারণ নিয়মের কারণে সেই বিশেষ আবেগটি অধিকতর জোরালো হচ্ছে কি না, অথবা এই আবেগটি এমন চরিত্রের কি না যা ব্যাখ্যায়িত হবার উর্ধ্বে এবং ফলত প্রকৃতির এক টি বিশেষ দান। আমরা যদি প্রশ্নটি সমাধানের জন্য প্রথমটির সপক্ষে তথ্যাদি পাই তবে সমস্যাটির গুরুত্বপূর্ণ দিকটি সমাধানের পথের সন্ধান পাব। আর যদি দ্বিতীয়টির সপক্ষে তথ্যাদি পাই তবে আমাদের অন্বেষার জন্য অন্য কোন পদ্ধতির সন্ধান করতে হবে।

নানা ধরনের জিনিসের মধ্যে সাধারণভাবে অবস্থিত গুণাগুণ সন্ধান করতে হলে জিনিসগুলোকে মূর্ত অবস্থায় হাজির করা আবশ্যক। তাহলে এবার আমরা সফলতার সাথে যে-ধরনের কার্যকলাপ বা মানব অবস্থাকে সার্বজনীনভাবে বা অধিকাংশের মতে ন্যায় বা অন্যায় বলে মনে করা হয় সেইগুলোকে বিবেচনা করতে আরম্ভ করি। এই আবেগগুলোকে উত্তেজিত করে বলে আমরা জানি তেমন ব্যাপার বহু প্রকারের প্রকৃতির হয়ে থাকে। কোন বিশেষভাবে না সাজিয়ে আমি এইগুলোকে সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

প্রথমত, প্রধানত কাউকে তার ব্যক্তি-স্বাধীনতা থেকে, তার সম্পত্তির অধিকার থেকে অথবা আইনত তার বলে গণ্য তেমন অন্য কোন জিনিস থেকে বঞ্চিত করাকে অন্যায় বলে গণ্য করা হয়। তাহলে এখানে আমরা "ন্যায়" ও "অন্যায়" পদগুলোর ব্যবহারের পূর্ণাঙ্গ নির্দিষ্ট অর্থে একটি দৃষ্টান্ত পাচ্ছি, যথা, **আইন-সঙ্গত অধিকারকে** সম্মান দেখানো ন্যায় কাজ এবং অসম্মান দেখানো অন্যায় কাজ। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত আবার কিছু কিছু ব্যতিক্রমকে স্বীকার করে নেয়, এই ব্যতিক্রমগুলো ন্যায়নীতি ও অন্যায়নীতির ধারণাগুলো যেভাবে নিজেদের প্রকাশ করে সেইগুলোর অন্যান্য আকার থেকে উদ্ভূত। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, যে-ব্যক্তি বঞ্চিত হচ্ছে সে হয়ত-বা তার সেই অধিকার বর্জন করেছে (বাক্যাংশটি এই ধরনেরই)—এই বিষয়টি নিয়ে আমরা পরবর্তীতে বিবেচনা করব। কিন্তু তাহলেও আরো অনেক প্রশ্ন থেকে যায়—

দ্বিতীয়ত, যে আইনগত অধিকার থেকে সে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়েছে সেই অধিকারটি হয়ত তার থাকাই উচিত ছিল না। অন্য কথায় বলতে হয়, যে-আইন তাকে এই অধিকার দিয়েছে সেটা একটি মন্দ আইন হতে পারে। যখন ব্যাপারটা এমন দাঁড়ায় অথবা যখন ব্যাপারটা এমন দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করা হয়

BanglaBook.org

(আমাদের বর্তমান বিবেচনার জন্য এই পার্থক্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়), তখন এক্ষেত্রে ন্যায় বা অন্যায় কতটুকু হচ্ছে সে-বিষয় নিয়ে মতবিরোধ হতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন যে আইন যত মন্দই হোক-না-কেন কোন নাগরিকের পক্ষে সেই আইনকে অমান্য করা উচিত নয়; এবং যদি সেই নাগরিক আইনটিকে মানার উপযুক্ত মনে না করে এবং তাকে যদি সে তথ্য প্রদর্শন করতেই হয়, তবে সে তা প্রকাশ করবে শুধুমাত্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ দ্বারা সেই আইনটিকে সংশোধনের মাধ্যমে। এই অভিমতের (যে-অভিমত মানবজাতির উপকারী বহু লোকের কার্যকলাপকে মন্দ বলে মনে করে এবং সেই সময়ের বাস্তব অবস্থায় এমন সকল অত্যন্ত ক্ষতিকর প্রতিষ্ঠানকে ঐ সকল অস্ত্রের আঘাত থেকে সংরক্ষণ করে যা সেই সকল প্রতিষ্ঠানকে ভেঙেচুরে ফেলতে সক্ষম) সপক্ষে তারাই বলে যারা সুবিধাবাদী অবস্থানে আছে। প্রধানত মানবজাতির সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই এই আইনের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করার প্রয়োজন আছে বলে প্রচার করা হয়। অন্য কেউ কেউ আবার একেবারে প্রত্যক্ষভাবে বিপরীত মতাবলম্বী। এরা বলেন যে, যে-সকল আইনকে মন্দ বলে বিবেচনা করা হবে যদিও এই মন্দত্ব অন্যায়ের কারণে না হয়ে শুধুমাত্র অসুবিধা সৃষ্টি করার কারণেও বিবেচিত হয়ে থাকে তবুও সেইগুলোকে অমান্য করাকে অপরাধহীন বলে মনে করা যায়। কেউ কেউ আবার শুধুমাত্র অন্যায় করা হচ্ছে বলেই যে সকল আইনকে মন্দ বলা হয় সেইগুলোকেই অমান্য করার কথা বলে। আবার অনেকে এমনও বলে যে, যে-সকল আইন অসুবিধা সৃষ্টিকারী সেগুলো আবার অন্যায় সৃষ্টিকারীও; কারণ প্রতিটি আইনই মানুষের প্রাকৃতিক স্বাধীনতাকে খর্ব করে এবং এই খর্ব করা তখনই ন্যায় বলে প্রতিপন্ন করা যায় যখন এর দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধন করা হয়। এই সকল নানাবিধ মতামতের মধ্যে এইটুকুই সার্বজনীন স্বীকৃত যে, অন্যায় আইন থাকতে পারে এবং ফলত কোন আইন ন্যায়নীতির চূড়ান্ত মানদন্ড হতে পারে না; আইন শুধুমাত্র কোন ব্যক্তির জন্য উপকারী হতে পারে অথবা অন্য কারো জন্য অশুভ হতে পারে, এবং ন্যায়নীতির এমন অবস্থাকে মন্দ বলা হয়ে থাকে। সে যাই হোক, যখন একটি আইনকে অন্যায় বলে মনে করা হয় তখন এমনটা মনে হয় ঐ ভিত্তিতেই যে আইন অমান্য করাটাই অন্যায়, যেমন, কারো অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা। তবে পরবর্তী ক্ষেত্রে এটা আইনগত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করাকে বোঝায় না, বরং এখানে নতুন একটি অর্থ সংযোগ করা হয় বলে সেটাকে নৈতিক অধিকার বলে নামকরণ করা হয়। সুতরাং আমরা এমন বলতে পারি যে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অন্যায়ের বিষয়টি কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু

BanglaBook.org

নেওয়া বা তাকে কিছু থেকে বঞ্চিত করার উপর নির্ভর করে, তবে এই ব্যক্তির সেই জিনিসের উপর নৈতিক অধিকার থাকতে হবে।

তৃতীয়ত, সার্বজনীনভাবে কোন কিছুকে ন্যায় বলে মনে করা হয় তখনই যখন প্রত্যেকে যা তার প্রাপ্য তা পায় (সেটা ভালই হোক আর মন্দই হোক), এবং কোন কিছুকে অন্যায় বলে মনে করা হয় তখনই যখন কেউ যা তার প্রাপ্য নয় তেমন মন্দ কিছু পায়। বোধহয় এইটাই হল সাধারণের মনে ন্যায় সম্বন্ধে যে ধারণা রয়েছে তার একটি সুস্পষ্ট ও জোরালো রূপ। এর সাথে যেহেতু ছিনিয়ে নেয়ার ধারণাটি জড়িত তাই প্রশ্ন উঠতে পারে এই ছিনিয়ে নেয়া ব্যাপারটি কি উপাদান দ্বারা গঠিত? সাধারণভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, একজন ব্যক্তি সম্বন্ধে তখনই বলা যাবে যে তার ভাল কিছু প্রাপ্য যখন সে যা সঙ্গত তা-ই করবে, এবং তার মন্দ কিছু প্রাপ্য হবে যদি সে অসঙ্গত তেমন কাজ সে করে। বিশেষ অর্থে বলতে হয় যে, সে যাদের ভাল করেছে তাদের কাছে তার ভাল কিছু প্রাপ্য এবং যাদের মন্দ করেছে তাদের কাছে তার মন্দ কিছু প্রাপ্য। মন্দ কিছুর বদলে ভাল কিছু দেয়া ন্যায়নীতির পরিপূরক বলে কখনও প্রদর্শিত হয় নি। বরং যখন এমনটা বলা হয় তখন সেই অবস্থায় ন্যায়নীতির দাবীকে বিবেচনার উর্ধ্বে নিয়ে গিয়ে তার স্থানে অন্য কোন বিবেচনার প্রতি বাধ্যতাকে প্রাধান্য দিতে হয়েছে।

চতুর্থত, এটা স্বীকার্যভাবে অন্যায় বলে বিবেচিত হয় যখন কেউ কারো **বিশ্বাস ভঙ্গ করে**: কোন অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, যা সুস্পষ্টভাবে শুধুমাত্র ইঙ্গিত দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে, অথবা অপরের মনে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা জ্ঞাতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে সৃষ্ট আশাকে ভঙ্গ করা হয়েছে। পূর্বে আলোচিত ন্যায়নীতির অন্যান্য কর্তব্যবোধের মত এই কর্তব্যবোধটি সম্বন্ধেও বলতে হয় যে, এটাকেও চরম কিছু বলে মনে করা হয় না। এই কর্তব্যবোধকে অন্যান্য অধিকতর জোরালো কর্তব্যবোধের বিবেচনায় দূরে সরিয়ে দেয়া যেতে পারে; অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিজস্ব কোন প্রকারের কার্যকলাপের কারণে তার প্রতি সেই কর্তব্যবোধ আমাদের মন থেকে দূরীভূত হয়ে যেতে পারে এবং এইভাবে যে-উপকার সে আশা করেছিল সেটা আইন ভঙ্গ করার কারণে হস্তচ্যুত হয়ে যেতে পারে।

পঞ্চমত, এটা সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে **পক্ষপাতিত্ব** দর্শানো ন্যায়নীতির পরিপন্থী—যথা, কোন একজনকে অপর একজনের তুলনায় অধিকতর সুবিধা দেয়া বা পছন্দ করা তেমন কোন ব্যাপারে যেখানে সুবিধা দেয়া বা পছন্দ করা যায় না। সে যাই হোক, পক্ষপাতহীনতা নিজের মধ্যেই নিজে একটি কর্তব্য বলে বিবেচিত নয়; বরং এটা হল অন্যান্য কর্তব্য পালনের পথে একটি উপায়

BanglaBook.org

মাত্র। কারণ এটা মানতে হয় যে সুবিধা দেয়া এবং পছন্দ করা সর্বদাই নিষিদ্ধ নয়। যথার্থই কিন্তু যে-সকল ক্ষেত্রে সেইগুলোকে মন্দ বলে বিবেচনা করা হয় যে সকল ক্ষেত্রে সেগুলো নিয়ম না হয়ে নিয়মের ব্যতিক্রমই হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তি যদি অন্যান্য কর্তব্য সম্পাদনকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে তার পরিবারকে বা বন্ধুবান্ধবকে অচেনা অজানা লোকের তুলনায় অধিকতর প্রাধান্য না দেয় তবে তাকে প্রশংসা না করে বরং দুর্নামই করা হয়ে থাকে। একজন থেকে অপরজনকে বন্ধু হিসেবে বা চেনামুখ হিসেবে বা সহকর্মী হিসেবে পছন্দ করাকে কেউই কখনও অন্যায় কাজ বলে মনে করে না। তবে অধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নে পক্ষপাতহীনতা অবশ্যই কর্তব্য বলে বিবেচিত হওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতার সাথে প্রত্যেককে তার অধিকার অর্জনে সহায়তা করার মতই একটি অধিকতর সাধারণ একটি কর্তব্যবোধ জড়িত। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একটি ট্রাইব্যুনাল বা বিচারকমণ্ডলীকে অবশ্যই পক্ষপাতহীন হতে হবে. কারণ অন্যান্য বিবেচনাকে অন্তর্ভুক্ত না করেই এই ট্রাইব্যুনালকে দুইটি পক্ষের মধ্যে যে-পক্ষের বিষয়টির উপর অধিকার আছে তার হাতেই বিবাদীয় বিষয়টিকে তুলে দিতে হবে। অন্যান্য ক্ষেত্রে পক্ষপাতহীনতা বলতে শুধুমাত্র পুরস্কার বা শাস্তি পাওয়ার মত গুণাগুণ বিচারে কোন অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত না হওয়াকে বোঝায়, যেমন হয়ে থাকে বিচারক বা শিক্ষক বা পিতামাতার আসনে বসে যখন পুরস্কার বা শাস্তি দেবার প্রশ্ন ওঠে তখন। আবার এমনও হয় যে জনগণের স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হওয়াকেও পক্ষপাতহীনতা বোঝায়, যেমন হয়ে থাকে সরকারী চাকুরীতে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে নির্বাচন করার সময়। অন্য কথায় বললে বলতে হয় যে, পক্ষপাতহীনতা বলতে ন্যায়নীতির একটি কর্তব্যবোধ হিসেবে যে বিশেষ বিষয় নিয়ে প্রশ্ন সেই বিষয়টি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া উচিত হবে এই বিবেচনা দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হওয়াকেই বোঝায়; এবং সেই সকল বিবেচনা যা নির্দেশ করবে তা ভিন্ন অন্য কিছু করার প্রেষণার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোকেও পক্ষপাতহীনতা বলা হয়।

পক্ষপাতহীনতার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত আরেকটি ধারণা হল **সাম্যের** ধারণা। এই ধারণাটি প্রায়ই ন্যায়নীতির ধারণা এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করা এই উভয় ধারণার গঠনের অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়, এবং অনেকের মতে এগুলোর সারসত্তাই হল সাম্যের ধারণা। কিন্তু এখানেও অন্যান্য ক্ষেত্রের চেয়েও অধিকতরভাবে ন্যায়নীতির ধারণাটি বিভিন্ন ব্যক্তির মনে ভিন্নতর রূপ নিয়ে থাকে, এবং সর্বদাই এই ভিন্নতা তাদের মনে উপযোগের ধারণার সাথে যুক্ত হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই মনে করে যে ন্যায়নীতির নির্দেশই হল সাধ্য।

BanglaBook.org

তবে প্রত্যেকে আবার এমনও মনে করে যে সুবিধার বিবেচনায় অসাম্যের বিধানই আবশ্যক বলে মনে হয় তেমন অবস্থা ব্যতিরেকে অন্য সকল অবস্থায়ই তেমন হবে। সকলের অধিকারকে সমভাবে সংরক্ষণ করাকে যাঁরা ন্যায়নীতি বলে মনে করেন তাঁরাই আবার অধিকারের বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অধিক অসাম্যের ধারণা পোষণ করেন। এমন কি যে-সকল দেশে দাসপ্রথা প্রচলিত আছে সেখানেও তাত্ত্বিকভাবে স্বীকার করা হয় যে দাসের অধিকার মনিবের অধিকারের মতই পবিত্র হওয়া উচিত, অবশ্য দাসের যেটুকু অধিকার আছে সেটুকু সম্বন্ধেই তেমন বলা হয়। যে ট্রাইব্যুনাল সমদৃঢ়তার সাথে সেই অধিকারকে সংরক্ষণ করতে সক্ষম নয় সে ট্রাইব্যুনাল ন্যায়নীতি প্রদর্শন করতে অক্ষম। আবার একই সময়ে যে সকল প্রতিষ্ঠান দাসদেরকে প্রায় কোন অধিকারই প্রদান করে না সেইগুলো ন্যায়নীতির পরিপন্থী বলে বিবেচিত হয় না, কারণ সেইগুলো সুবিধাবাদের পরিপন্থী বলে বিবেচিত নয়। যারা মনে করে অবস্থানের মর্যাদা উপযোগিতার জন্য আবশ্যক তারা ধনী ও সামাজিক সুবিধাপ্রাপ্তদের জন্য অসাম্যকে অন্যায় বলে বিবেচনা করে না। কিন্তু যারা এই অসাম্যকে অসুবিধাজনক বলে মনে করে তারা এই অবস্থানকে আবার অন্যায় বলেও মনে করে। যারা সরকার থাকা প্রয়োজন বলে মনে করে তারা ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে তেমন ক্ষমতা প্রদান করা অন্যায় বলে মনে করে না যেমন ক্ষমতা অন্যান্য লোকের নেই। এমন কি যারা এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য আছে তেমন মতবাদের বিশ্বাসী তাদের মধ্যেও উপযোগিতার বিষয়ে মতবিরোধ আছে। কোন কোন কম্যুনিস্ট মনে করেন যে একটি জনসমষ্টির শ্রমের দ্বারা প্রাপ্ত উৎপাদনকে সমভাবে সকলের মধ্যে বণ্টন না করা হলে তা ন্যায়নীতির পরিপন্থী হয়। আবার তাঁদেরই কেউ কেউ মনে করেন যে যাদের অধিকতম প্রয়োজন তাদেরকে অধিকতম পরিমাণের উৎপাদন দেয়াই হল ন্যায়। অন্যরা আবার মনে করেন যে যারা অধিক শ্রম করে বা যারা অধিক উৎপাদন করে অথবা যাদের কাজ জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক মূল্যবান তারা ন্যায়তভাবেই উৎপাদনের একটি বৃহৎ কোটা বা অংশ (quota) দাবী করতে পারে। এই সকল অভিমত প্রণয়নের ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক ন্যায়নীতির প্রতি সমভাবেই আবেদন করা হয়ে থাকে।

এখন 'ন্যায়নীতি' পদটির এই সকল বিভিন্নধর্মী অভিমতের মধ্যে, যেগুলোকে এখন পর্যন্ত বিভ্রান্তিকর বলে মনে করা হয় নি, মানসিক সংগতি যে কি বা এদেরকে এক সাথে গেঁথে রেখেছে এবং যার উপরে এই পদটির সাথে যুক্ত নৈতিক আবেগটি আবশ্যিকভাবে জড়িত রয়েছে সেটা নির্ণয় করা একটি কঠিন ব্যাপার। এই বিভ্রান্তকর অবস্থায়, পদটির শাব্দিক অর্থ যে দিকে নির্দেশ দেয় সেই সূত্র ধরে পদটির ইতিহাসকে বিবেচনা করা বোধহয় আমাদের জন্য সহায়ক হতে পারে।

BanglaBook.org

সকল ভাষাতে না হলেও প্রায় সকল ভাষাতেই 'ন্যায়' শব্দটির উৎসটি আইনের নির্দেশের সাথে জড়িত রয়েছে। ***Justum*** হল ***jussum*** শব্দটির একটি রূপ, অর্থ হল 'যা নির্দেশিত হয়েছে'। ***Dikaion*** প্রত্যক্ষভাবে ***dike*** শব্দটি থেকে এসেছে, অর্থ হল আইনের মামলা-(suit of law)। ***Recht*** শব্দটি আইনের সমার্থক, এবং এর থেকে ***right*** এবং ***rigteous*** শব্দগুলো এসেছে। ন্যায়নীতির বিচারালয় ও ন্যায়নীতির বিধান বলতে আইনের বিচারালয় ও আইনের বিধানকেই বোঝায়। ফরাসী ভাষায় ***La justice*** হল বিচার কার্য সম্পন্ন করার ক্ষমতার (judicature) জন্য একটি প্রতিষ্ঠিত পদ। আমি অবশ্য তেমন কোন হেত্বাভাস এখানে সম্পাদন করছি না যা Horne Tooke[১] সম্পাদন করেছেন বলে কিছুটা সত্যতার সাথে বলা হয়ে থাকে: হেত্বাভাসটি এই বলে সম্পাদিত হয়েছে যে কোন শব্দ বুৎপত্তিগত প্রাথমিক অর্থ নিয়েই সর্বদা অপরিবর্তিত হয়েই বিরাজ করতে থাকবে। বুৎপত্তিগতভাবে শাব্দিক অর্থ বর্তমানে শব্দটি যে কি অর্থ বহন করছে তার সামান্য ইঙ্গিত দেয় মাত্র, তবে কিভাবে শব্দটির উৎপত্তি হল সে-বিষয়ে প্রচুর আলোকপাত করতে পারে। আমার মনে হয়, ন্যায়নীতির ধারণাটি রূপ ধারণ করার জন্য ***idée mére*** অর্থাৎ এই ধারণার আদিম উপাদানটি যে আইনসঙ্গত হওয়াকে বোঝায় সে-সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। হিব্রুদের ন্যায়-নীতির ধারণার মধ্যে এই উপাদানটিই সম্পূর্ণভাবে প্রাধান্য পেয়েছে, অন্তত তেমনটা দেখা যায় খ্রীস্টের জন্মকাল পর্যন্ত। যে-জাতি বিশ্বাস করে যে সকল আইনই প্রত্যক্ষভাবে পরম প্রভুর নিকট থেকে আগত এবং যাদের জন্য সকল বিষয়েই আইনকে তেমন নির্দেশের আওতাভুক্ত হতে হয় সে জাতির ক্ষেত্রে তেমনটাই আশা করা যায়। তবে অন্যান্য জাতি, বিশেষ করে রোমান ও গ্রীক জাতির মত জাতিগুলো জানে যে যেহেতু তাদের আইন প্রাথমিকভাবে মানুষের দ্বারাই প্রণীত হয়েছে এবং পরবর্তীতেও মানুষই প্রণয়ন করবে, সেহেতু মন্দ আইনও যে মানুষ প্রণয়ন করতে পারে সেকথা এই জাতিগুলো স্বীকার করতে ভীত হয় না। যারা আইনের অনুমোদন ব্যতিরেকেই অন্যায় কাজ করে ও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে অন্যায় কাজ করে থাকে সেই সকল সাধারণ মানুষের মতই যে কখনও কখনও আইন প্রণয়নকারী ব্যক্তিরাও অন্যায় আইন প্রণয়ন করতে পারে সে কথাও এই সকল জাতি নির্দ্বিধায় স্বীকার করে। সেই জন্যই অন্যায় করার বিষয়ে আবেগটি সকল আইন অমান্যকরণের সাথে

১. John Horne (1736—1812), ছদ্মনাম হল William Tooke; ***Reflection On Revolution*** গ্রন্থের প্রণেতা।

BanglaBook.org

জড়িত না হয়ে শুধুমাত্র যে-সকল আইন প্রচলিত থাকা **উচিত** সেইগুলোর সাথেই জড়িত হয়েছে। এই আবেগটি উপরন্তু যে-সকল আইন প্রচলিত থাকা উচিত কিন্তু বাস্তবে প্রণীত হয় নি সেইগুলোর সাথে এবং যে-সকল আইন যা প্রণীত হওয়া উচিত তার বিরোধিতা করে সেইগুলোর সাথেও জড়িত হয়ে আছে। এইভাবে আইনের ধারণা ও আইনের নির্দেশ ন্যায়নীতির ধারণার সাথেই সুস্পষ্ট হয়ে আছে তখনও যখন আইন ন্যায়নীতির মাপকাঠি রূপে আর বিরাজ করছে না।

একথা সত্য যে, মানব জাতি ন্যায়নীতির ধারণাকে এবং ন্যায়নীতির নৈতিক বন্ধনকে এমন অনেক কিছুর উপর আরোপিত হতে পারে বলে বিবেচনা করে যা আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় বা নিয়ন্ত্রিত হোক তেমনটি কামনাও করা হয় না। কেউই কামনা করে না যে আইন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যক্তিগত জীবনকে শাসন করবে। কিন্তু তবুও প্রত্যেকেই কোন ব্যক্তিকে দৈনন্দিন জীবনের কার্যকলাপে নিজেকে ন্যায়পরায়ণ বা ন্যায়বিগর্হিত বলে প্রতিপন্ন করার সুযোগ দিয়ে থাকে। তবুও এখানেও যেমনটি আইন হওয়া উচিত তাকে ভঙ্গ করার ধারণাটি একটি পরিবর্তিত রূপ ধারণ করে অবস্থান করে। আমাদের জন্য সর্বদাই সুখকর হবে এবং আমাদের মনে উপযুক্ততার অনুভূতির সাথে খাপ খেয়ে যাবে যদি আমাদের মতে যে-সকল কাজ অন্যায় সেইগুলো সম্পাদনের জন্য শাস্তি দেয়া হয়, যদিও ট্রাইব্যুনালের দ্বারা তেমনটা করাই যে উচিত হবে সে অবস্থাকে আমরা সকল সময় উপযোগী বলে মনে করি না। কিন্তু আমরা আমাদের এই ধরনের তৃপ্তিকে বর্জন করি ঘটনাচক্রে সৃষ্ট অসুবিধার কথা বিবেচনা করে বলে। আমরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ন্যায় কার্যকলাপের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও অন্যায় কার্যকলাপকে দমিত হতে দেখলেই খুশী হতাম, যদি না ম্যাজিস্ট্রেটদের হাতে জনগণের উপর আরোপের জন্য অসীম ক্ষমতা অর্পণ করতে যুক্তিযতভাবেই ভয় না পেতাম। যখন আমরা মনে করি যে কোন ব্যক্তি কাজ করতে ন্যায়নীতি পালনে শর্তাবদ্ধ তখন সাধারণ অর্থে এটাই বোঝাই যে সে তেমনটা করতেই নৈতিকভাবে বাধ্য। আমরা যার সেই ধরনের ক্ষমতা আছে তার উপর সেই কর্তব্যবোধটিকে প্রতিষ্ঠিত করার ভার দিয়ে আশ্বস্ত হই। যখনই আমরা আইন দ্বারা নৈতিক বাধ্যবাধকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার বিষয়টিকে অসুবিধা-জনক বলে বুঝতে পারি তখন আমরা এই অপারগতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করি। যখন অন্যায়ের শাস্তিহীনতা লক্ষ্য করি তখন সেটাকে অশুভ বলে বিবেচনা করি, এবং অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাদের নিজেদের মতামত সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করি ও দোষীর প্রতি জনসাধারণের অনুমোদন না পাওয়ার বিষয়টি সর্বসম্মুখে তুলে ধরি। যদিও প্রগতিশীল সামাজিক অবস্থার মধ্যে বিরাজমান ন্যায়নীতির ধারণা সম্পূর্ণ রূপ ধারণ করতে এই ধারণাকে বহুবার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে

BanglaBook.org

যেতে হয়েছে, তবুও আজও পর্যন্ত এইভাবেই আইনের মধ্যে সীমিত থাকার ধারণাটি ন্যায়নীতির ধারণার পেছনে একটি উৎসারিত শক্তি হয়েই আছে।

আমার মতে, ন্যায়নীতির ধারণাটির উৎস ও ক্রমান্বয় পরিবর্তিত রূপের একটি যথাসম্ভব সঠিক বিবরণ উপরে উক্ত হল। তবে আমাদের এই তথ্যটি লক্ষ্য করতে হবে যে ন্যায়নীতির সাথে সম্পৃক্ত কর্তব্যবোধের সাথে সাধারণ নৈতিক কর্তব্য-বোধের পার্থক্য নির্ধারণের মত কিছুই এখন পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়ে নি। বাস্তব সত্য এই যে শাস্তি-অনুমোদনের (penal sanction) ধারণাটি, যা হল আইনের মূল কথা, শুধু যে অন্যায়ের ধারণার সাথে জড়িত তা নয়, বরং সেটা সকল প্রকারের অসঙ্গত কার্যকলাপের ধারণার সাথেই জড়িত। আমরা তখনই কোন কার্যকে অসঙ্গত বলি যখন আমরা ঐ কার্য সম্পাদন করার জন্য তার কোন-না-কোন প্রকারের শাস্তি পাওয়া উচিত বলে মনে করি—যদি আইনগত উপায়ে তেমনটা সম্ভব নাও হয় তবুও তার সহসৃষ্টি সমাজের অন্যান্য মানুষের মতামত প্রকাশ দ্বারা তেমন অবস্থা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়, আর যদি এই মতামত প্রকাশ দ্বারা তেমনটা করা সম্ভব না হয় তবে তার নিজের বিবেকের দংশনই তার শাস্তি হয়ে দাঁড়ায়। এইটাই হল নৈতিকতা এবং সরল সুবিধাবাদের মধ্যে পার্থক্যের বিশিষ্ট দিক। কর্তব্যের ধারণার প্রতিটি রূপের মধ্যে বিরাজমান এই রূপটি এমন যে প্রতিটি ব্যক্তি এই ধারণা অনুযায়ী চালিত হতে বাধ্য। কর্তব্য এমন একটি বিষয় যা ব্যক্তিদের নিকট থেকে আদায় করে নিতে হয়, যেমন ঋণ আদায় করতে হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু আদায় করার প্রশ্নটি আমাদের মনে না জাগে ততক্ষণ পর্যন্ত সেটাকে কর্তব্য বলে আমরা আখ্যায়িত করি না। দূর-দর্শিতার কারণ, বা অন্য লোকের স্বার্থ বিবেচনা বাস্তব ক্ষেত্রে এমন আদায়ের পক্ষে অন্তরায় হয়। কিন্তু তবুও সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে কোন ব্যক্তি নিজে এ ব্যাপারে আর কোন অনুযোগ করতে পারে না। অন্য দিকে এমন অনেক কার্যকলাপ রয়েছে যেগুলো লোকে সম্পাদন করুক তেমনটা আমরা চাই, এবং সেইগুলো সম্পাদন করলে আমরা তাদেরকে পছন্দ করি বা প্রশংসা করি এবং সেগুলো না সম্পাদন করলে হয়ত অপছন্দ করি বা নিন্দা করি। কিন্তু তবুও তারা যে সেইগুলো করতে বাধ্য নয় সেটা আমরা মেনে নিই। এগুলো নৈতিক কর্তব্যবোধের আওতাভুক্ত নয়। আমরা তাদেরকে দোষী মনে করি না, অর্থাৎ আমরা মনে করি না যে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত। খুব সম্ভব, ধীরে ধীরে শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠবে কিভাবে আমরা শাস্তি প্রাপ্য বা প্রাপ্য নয় এই ধারণাগুলোর সংস্পর্শে এসেছি। কিন্তু আমি মনে করি যে এই পার্থক্যটি নীতিসঙ্গত ও নীতিবিগর্হিত এই ধারণাগুলোর মূলের সাথেই সম্পৃক্ত রয়েছে। কোন কার্য-

BanglaBook.org

কলাপকে যখন আমরা অসঙ্গত বলি, অথবা যদি অসঙ্গত না বলে অপছন্দের বা অসম্মানজনক বা এই ধরনের পদকে ব্যবহার করি তখন আমরা অবশ্যই সেই ব্যক্তির কার্যকলাপের জন্য শাস্তি প্রাপ্য কি প্রাপ্য নয় তেমনটা মনে রেখেই তা করি। আবার যখন আমরা সেটাকে সঙ্গত বলি বা অন্ততঃপক্ষে কাম্য বা প্রশংসনীয় মনে করি তখনও আমাদের মনে যে-ব্যক্তির কার্যকলাপ নিয়ে প্রশ্ন তাকে সেই-ভাবে কার্যকলাপ করতে বাধ্য বা অন্ততঃপক্ষে প্ররোচিত করতে বা প্রণোদিত করতে চাই।[২]

সুতরাং সাধারণ নৈতিকতার সাথে ন্যায়নীতির নয়, বরং সুবিধাবাদিতা বা যোগ্যতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোর পার্থক্যকে এই বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিরূপণ করা যায়; কিন্তু ন্যায়নীতির সাথে নৈতিকতার অন্যান্য শাখার মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়-কারী বৈশিষ্ট্যের সন্ধান এখনও পাওয়া যায় নি। এটা জানা বিষয় যে নীতিবিদ্যার লেখকেরা নৈতিক কর্তব্যকে দুইটি ভাগে বিভক্ত করেছেন যা দুষ্ট-পছন্দকৃত উক্তি দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে: পূর্ণাঙ্গ বাধ্যতাবোধসম্পন্ন কর্তব্য ও অপূর্ণাঙ্গ বাধ্যতা-বোধসম্পন্ন কর্তব্য। পরবর্তীটি এমন যেখানে যদিও কাজটি সম্পাদন করা নৈতিক বাধ্যতাবোধের দিক থেকে করণীয়, তবুও কোন বিশেষ অবস্থায় সেটাকে সম্পাদন করা-না-করা আমাদের নিজেদের পছন্দের উপর নির্ভর করে, যেমনটা দান করা অথবা উপকার করার বিষয়ে হয়ে থাকে, যেগুলো আমরা করতে বাধ্য তবে কোন বিশেষ ব্যক্তিকেই প্রদর্শন করবো বা কোন বিশেষ সময়েই তা করতে হবে তেমন নয়। দার্শনিক আইনজ্ঞব্যক্তিদের (jurists) অধিকতর সুস্পষ্ট ভাষায় বললে বলতে হয় যে, পূর্ণাঙ্গ নৈতিক বাধ্যতাবোধসম্পন্ন কর্তব্য তেমন কর্তব্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে যেখানে বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমূহের **অধিকারকে** বিবেচনা করতেই হয়। অপূর্ণাঙ্গ নৈতিক বাধ্যতাবোধ থেকে উদ্ভূত কর্তব্য হল ঐ ধরনের নৈতিক কর্তব্য যা কোন ব্যক্তির অধিকারকে বিবেচনা করে না। আমার মনে হয়, ন্যায়নীতি ও নৈতিকতার অন্যান্য বাধ্যতা-বোধের মধ্যে পার্থক্যটি এই ধরনেরই কিছু হবে বলে প্রতিপন্ন হবে। ন্যায়নীতির নানা প্রকারের সাধারণভাবে গৃহীত ধারণাগুলোর আমাদের দ্বারা যে জরীপ ইতিমধ্যেই করা হয়েছে, তার থেকে এমনই বোঝা যায় যে এই পদটি ব্যক্তি-গত অধিকারকে সাধারণভাবে জড়িত করছে—এক বা বহু ব্যক্তির দাবীকে, যেমনটা মালিকানা বা অন্যান্য আইনগত অধিকারকে আইন ফিরিয়ে দিয়ে থাকে। কাউকে তার সম্পত্তি না দেয়া, বা তার সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করা,

২. এই বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করেছেন Professor Bain তাঁর "The Ethical Emotions, or the Moral Sense", ***Mind***. প্রবন্ধে।

বা তার যেমন ব্যবহার প্রাপ্য তার সাথে তার চেয়ে মন্দ ব্যবহার করা অথবা যাদের অধিকতর দাবী আছে তাদের প্রতি মন্দতর ব্যবহার করা, অন্যায় বলতে এর যে কোনটাকে বোঝানো হোক-না-কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিন্তু অন্যায়ের অনুমানটি দুইটি ইঙ্গিত দেয়: একটি অসঙ্গত কাজ সম্পাদন করা হয়েছে, এবং অধিকার দেয়া হয়েছে যেমন নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি আছে যার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কোন ব্যক্তির প্রতি অন্যান্য ব্যক্তিদের চেয়ে অধিকতর ভাল ব্যবহার করাটাও অন্যায়, তবে এক্ষেত্রে অন্যায়টা করা হচ্ছে সেই ব্যক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীদের প্রতি, যারা আবার নির্দিষ্ট ব্যক্তিও বটে। আমার এমন মনে হয় যে, এই ক্ষেত্রে এই যে বৈশিষ্ট্যটি এটাই হল ন্যায়নীতি এবং বদান্যতা বা উপকারের মধ্যেকার বিশেষ পার্থক্য—কোন ব্যক্তির অধিকার যে নৈতিক কর্তব্যবোধের সাথে জড়িত আছে সে বিষয়টি। ন্যায়নীতি এমন কিছুর প্রতি ইঙ্গিত করে যা সম্পাদন করাই শুধুমাত্র সঙ্গত নয় বা সম্পাদন না করাই অসঙ্গত নয়, বরং যা কোন বিশেষ ব্যক্তি তার নৈতিক অধিকার হিসেবে আমাদের নিকট দাবী করতে পারে। কারো নৈতিক অধিকার হিসেবে আমাদের কাছে বদান্যতা বা উপকার দাবী করার অধিকার নেই। কারণ আমাদের যে ঐ সকল সদগুণ কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি প্রদর্শন করতে হবে তেমন নৈতিক বন্ধন নেই। কোন সঠিক সংজ্ঞা সম্বন্ধে যেমন বলা যায় তেমনি এই বিষয়টি নিয়েও বলা যায় যে এর সাথে যে-সকল দৃষ্টান্তের সংঘাত হচ্ছে বলে মনে হয় সেগুলো এ সিদ্ধান্তকে আরো জোরালোভাবে স্বীকার করে নিচ্ছে। কারণ যদি কোন নীতিবিদ চেষ্টা করেন, যেমন অনেকেই ইতিমধ্যে করেছেন, এমনটা প্রদর্শন করতে যে কোন বিশেষ ব্যক্তি না হলেও সাধারণত মানব জাতির সকল সদস্যের আমরা দিতে সক্ষম তেমন ভাল জিনিস পাবার একটি অধিকার আছে, তবে এইভাবে তিনি এই মতবাদ দ্বারা তখনই কিন্তু বদান্যতা এবং উপকারকে ন্যায়নীতির শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছেন। তিনি তখন বলতে বাধ্য যে আমাদের সহসৃষ্টিদের প্রতি আমাদের আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রদর্শন করা উচিত আর এইভাবে তাদেরকে আমাদের প্রতি ঋণপাশে আবদ্ধ করা হবে, অথবা তিনি বলতে বাধ্য যে সমাজ আমাদের জন্য যা করে তার পরিবর্তে আমরা এর চেয়ে ন্যূনতম কিছু করতে পারি না, এবং এইভাবে কৃতজ্ঞতার প্রশ্নটি এসে যায়। এই উভয়টিই (ঋণপাশে আবদ্ধ হওয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা) কিন্তু ন্যায়নীতির স্বীকৃত দৃষ্টান্ত এবং উপকারিতা নামক সদগুণের কোন দৃষ্টান্ত নয়। যাঁরা ন্যায়নীতি ও সাধারণ নৈতিকতার মধ্যেকার পার্থক্যকে আমরা যেভাবে স্থির করেছি সেভাবে না দেখে অন্যভাবে দেখেন তাঁরা এগুলোর মধ্যে অন্য কোন পার্থক্যই আর

BanglaBook.org

দেখতে সক্ষম হবেন না, বরং ন্যায়নীতির মধ্যেই সকল নৈতিকতাকে একত্রিত করে মিলিয়ে মিশিয়ে ফেলবেন।

ন্যায়নীতির ধারণাটি গঠনের মধ্যে বিশিষ্ট উপাদানটিকে এইভাবে নির্ধারণ করার প্রচেষ্টার পর আমরা এবার অন্য অন্বেষার সম্মুখীন হচ্ছি: এই অনুভূতিটি যে ধারণাটিকে বহন করছে সেটা প্রকৃতিরই কোন বিশেষ দান কি না, বা, বিশেষ অর্থে, এই ধারণাটি সাধারণ সুবিধার বিবেচনা থেকে উদ্ভূত কিনা।

আমার বিবেচনায় এই আবেগটি নিজের মধ্যে সাধারণভাবে বা সঠিকভাবে সুবিধা বলতে যা বোঝায় সে রকম কিছু থেকে উদ্ভূত হয় নি। তবে এই আবেগটি তেমনভাবে উদ্ভূত না হলেও এর মধ্যেকার নৈতিক দিকটি তেমনভাবেই উদ্ভূত হয়েছে।

আমরা পূর্বেই দেখেছি যে ন্যায়নীতির আবেগের মধ্যে দুইটি আবশ্যিক উপাদান রয়েছে যেগুলো হল: যে ক্ষতি করেছে তাকে শাস্তি দেবার ইচ্ছা এবং সে রকম কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ রয়েছে বলে আমরা জানি বা বিশ্বাস করি যার বা যাদের ক্ষতি করা হয়েছে।

আমার মনে হয় যে যে-ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি করেছে তাকে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছাটা দুইটি বিশেষ আবেগ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে উদ্ভূত, এই আবেগগুলোর উভয়ই অত্যন্ত অধিক পরিমাণে স্বভাবিক বা প্রাকৃতিক এবং উভয়ই হয় প্রবণতা বা প্রবণতার মতই অন্য কিছু: আত্মরক্ষার ঝোঁক এবং সমবেদনার অনুভূতি।

আমাদের নিজেদের প্রতি বা আমরা যাদের প্রতি সমব্যথী তাদের প্রতি কোন ক্ষতি করা হলে বা ক্ষতি করার চেষ্টা করা হলে আমরা যে সেটার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করব বা সেটাকে প্রতিরোধ করতে বা সেটার প্রতিশোধ নিতে চাইব সেটা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। এই আবেগের উৎস নিয়ে এখানে আলোচনা করার কোন প্রয়োজন নেই। এটা একটা প্রবণতা বা বুদ্ধি ব্যবহারের ফল যেটাই হোক-না-কেন এটা সকল প্রাণীদের প্রকৃতির মধ্যেই সাধারণভাবে অবস্থান করছে। কারণ প্রতিটি প্রাণীই কেউ তাকে বা তার সন্তানদের আঘাত করছে বা করতে যাচ্ছে বলে মনে করলে সেটাকে পাল্টা আঘাত করে থাকে। মানুষ কেবলমাত্র দুইটি বিশেষ দিক দিয়ে অন্য প্রাণীদের থেকে ভিন্ন। প্রথমটি হল, মানুষ শুধুমাত্র তার সন্তানের প্রতিই সহানুভূতিসম্পন্ন হয় না, যেমন অন্য কিছু কিছু উন্নত প্রাণী অন্যান্য উন্নততর প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়, যারা তাদের প্রতি দয়া বা মায়া প্রদর্শন করে। মানুষ বরং সকল মানুষের প্রতি এবং এমন কি সকল চেতনশীল প্রাণীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ার ক্ষমতা রাখে। দ্বিতীয়টি হল, মানুষের ধীশক্তি অধিকতর উন্নত বলে তাদের

BanglaBook.org

আবেগ প্রদর্শনের ক্ষেত্রটিও ব্যাপকতর হয়েছে, সেটা নিজের ব্যাপারেই হোক বা অন্যের প্রতি সহানুভূতির ব্যাপারেই হোক। তার উন্নততর ধীশক্তির কারণে, সহানুভূতির ক্ষেত্রটির উন্নততর ব্যাপকতার বিবেচনা ব্যতিরেকেই, মানুষ নিজের ও যে-মানবসমাজের সে নিজে একটি অংশ এই দুইটির মধ্যে একটি সাধারণ স্বার্থকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। এই অনুধাবন এতই শক্তিশালী হয় যে এই-ভাবে যখনই কোন কার্যকলাপ সমাজের নিশ্চয়তার প্রতি হুমকী হয়ে দাঁড়ায় তখনই সে সেটাকে নিজের প্রতিই হুমকী হয়ে দাঁড়াচ্ছে বলে মনে করে, এবং ফলত সে তখন তার আত্মরক্ষার প্রবণতার (যদি সেটা প্রবণতা হয়) আশ্রয় নেয়। এই একই উন্নত ধীশক্তি মানুষকে সাধারণ মানুষের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়ার ক্ষমতার সাথে মিলিত হয়ে তার গোষ্ঠী, তার দেশ অথবা সমগ্র মানব জাতির ধারণার সাথে এমন ভাবে এক করে ফেলে যে এদের প্রতি ক্ষতিকারক যে-কোন কার্যকলাপ সম্পাদিত হতে দেখলেই তার মধ্যে সহানুভূতির প্রবণতা দেখা দেয় এবং সে তখন সেইগুলোকে বাধা প্রদান করে।

আমার ধারণা এমন যে, ন্যায়নীতির আবেগের মধ্যে শাস্তি প্রদানের ইচ্ছা বলে যে উপাদানটি আছে সেটা ধীশক্তি ও সহানুভূতি দ্বারা এই উপায়েই লালিত হয়ে ঐ সকল আঘাত, অর্থাৎ ঐ সকল ক্ষতি যেগুলো আমাদেরকে আঘাত করে, বা একই সাথে আমাদের সমাজকে সামগ্রিকভাবে আঘাত করে সেইগুলোর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। আবেগটির নিজের মধ্যে তেমন কোন নৈতিক উপাদান নেই। যেটুকু নৈতিক বিষয় এটার সাথে জড়িত রয়েছে সেটুকু সম্পূর্ণভাবে সামাজিক সহানুভূতিরই অধীনস্থ একটি দিক; এই আবেগটি সামাজিক সহানুভূতির দাস এবং এই সহানুভূতির ডাক মেনে চলে। কারণ স্বাভাবিক অনুভূতি আমাদেরকে শুধুমাত্র কোন ভেদাভেদ বিচার না করে আমাদের কাছে যা কিছু অপছন্দের মনে হবে সেইগুলোর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করার প্রতিই প্রবল করে তোলে। কিন্তু যখনই আমরা সামাজিক অনুভূতি দ্বারা নীতিভাবাপন্ন হয়ে পড়ি তখনই আমরা সাধারণের কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে কার্যকলাপে রত হই। একজন ন্যায়বান ব্যক্তি তাঁর নিজের কোন ক্ষতি না হলেও শুধুমাত্র সমাজের কোন ক্ষতি হলেই সেই ক্ষতিতে বিরক্তি প্রকাশ করেন, আবার নিজের প্রতি ক্ষতি হলেও সেটা যতই অধিক বেদনাদায়ক হোক-না-কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা সমাজের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য হুমকী না হয়ে দাঁড়ায় ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষতিকর বিষয়টিকে বাধা প্রদান করেন না।

এই মতবাদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর কিছু বলা হবে না যদি বলা হয় যে, যখন আমরা আমাদের মধ্যে ন্যায়নীতির আবেগটিকে অতিশয় জাগ্রত হতে দেখি তখন আমরা

BanglaBook.org

আমাদের সমষ্টিগত স্বার্থকে না বুঝে বরং আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থকে বুঝি। নিশ্চিত-ভাবেই বলা যায়, যদিও বিপরীতটিই প্রশংসাযোগ্য অবস্থা তবুও আমরা নিজেরা বেদনাগ্রস্ত হলেই বিরক্তি প্রকাশ করব তেমনটা ঘটাই অত্যন্ত সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু যখনই কোন ব্যক্তির এই বিরক্তি প্রকাশ নৈতিক ভাবমূর্তি ধারণ করবে, অর্থাৎ যখন সে একটি কাজকে দোষণীয় মনে করে বলেই সেটার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করবে, তখন সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই অনুধাবন করবে যে সে একটি নিয়মকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাচ্ছে যা তার নিজের জন্য যেমন উপকারী তেমনি সকলের জন্যও উপকারী, যদিও বা এই তথ্যটি তার নিজের কাছেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না যে সে সমাজের স্বার্থে এমনটি করতে চাচ্ছে। সে যদি এমনটি অনুভব না করে অর্থাৎ সে যদি কাজটি কেবল তার নিজের উপর যে ফলাফল বিস্তার করবে সে বিবেচনাই শুধু করে, তবে সে সচেতনভাবে ন্যায়বান নয়। এই অবস্থায় সে তার কাজটির ন্যায়নীতির দিকটিকে বিবেচনাধীন করছে না। এই তথ্যটি এমন কি উপযোগবাদ বিরোধী নীতিবিদরাও স্বীকার করেছেন। ক্যান্ট (Kant) যখন (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) নৈতিকতার মৌলনীতি বলে নিম্নোক্তটিকে উল্লেখ করেন, "এমন কাজ কর যেন তোমার কার্যকলাপের রীতিটিকে একটি নিয়ম হিসেবে সকল বোধসম্পন্ন প্রাণীর দ্বারা পালন করা সম্ভব হয়," তখন তিনি এক রকম এই তথ্যটিই স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে যখনই কোন কাজের নৈতিকতা সম্বন্ধে বিবেকসম্পন্নভাবে বিবেচনা করা হবে তখন মানব জাতির সমষ্টিগত স্বার্থ, বা অন্ততঃপক্ষে সমস্ত মানব জাতির স্বার্থের কথা অবশ্যই কর্মকর্তাকে মনে রাখতে হবে। অন্যথায় তিনি শব্দগুলোকে অর্থহীন-ভাবে ব্যবহার করেছেন। কারণ, এমন কি সম্পূর্ণ স্বার্থহীন তেমন কোন বিষয় পর্যন্ত কখনও সকল বোধসম্পন্ন প্রাণীর দ্বারা গ্রহণীয় হতে পারে না—এই গ্রহণীয়-তার জন্য [প্রাণীর] প্রকৃতিগত কোন অলঙ্ঘণীয় বাধা আছে এমন কথা ন্যূনতম যৌক্তিকতার সাথেও পোষণ করা সম্ভব নয়। ক্যান্টের নীতিকে অর্থবহ করে তুলতে হলে এমন অর্থই প্রদান করতে হবে যে আমাদের কার্যকলাপকে এমন সকল নিয়ম দ্বারা চালিত করতে হবে যাতে সকল বোধসম্পন্ন প্রাণী এই সকল নিয়মকে সাধিকভাবে গ্রহণ করবে এবং যেগুলো তাদের সকলের পক্ষে **সমষ্টিগত স্বার্থরক্ষার সহায়ক হবে।**

ওপরে যা বলা হল তার পুনরুক্তি করছি: ন্যায়নীতির ধারণা দুইটি বিষয়কে অনুমান করে নেয়—কার্যকলাপের জন্য একটি নিয়ম এবং এই নিয়মটিকে অনুমোদন করে তেমন একটি আবেগ। প্রথমটিকে অবশ্যই সকল মানুষের মধ্যেই অবস্থান করছে বলে ধরে নিতে হবে এবং সকল মানুষের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে প্রণীত

BanglaBook.org

হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। দ্বিতীয়টি (আবেগটি) হল, যে এই নিয়ম ভঙ্গ করছে তাকে যে শাস্তি ভোগ করতে হবে সেই ইচ্ছা বা কামনা। উপরন্তু, এর সাথে যুক্ত রয়েছে এমন ধারণা যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি এই নিয়ম ভঙ্গের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বা কষ্টভোগ করেছে এবং তার অধিকারকে (এই ক্ষেত্রে এই প্রকাশভঙ্গীই উপযুক্ত) এইভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আমার মনে হয় যে, ন্যায়নীতির আবেগ হল ক্ষতির বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো অথবা ক্ষতির শোধ নেয়ার জন্য একটি জীববৃত্তিক কামনা, নিজের প্রতি বা যাদের প্রতি সমবেদনা রয়েছে তাদের প্রতি, এবং এই সমবেদনার ক্ষেত্রটি সমবেদনা প্রকাশের ক্ষেত্র সম্প্রসারণের অসাধারণ মানবিক ক্ষমতার কারণে এবং ধীসম্পন্ন স্বার্থ সম্বন্ধে মানুষের মানবিক ধারনার কারণে সমস্ত মানুষকে অন্তর্ভুক্ত করে থাকে, এবং সেই জন্য সকল মানুষের সমষ্টিগত ক্ষতি সাধন করা হলে এই কামনাটি আমাদের মধ্যে জাগ্রত হয়। এই পরবর্তী উপাদানগুলো থেকেই ন্যায়নীতির আবেগ তার নৈতিকতা আহরণ করে; এবং পূর্ববর্তীটি থেকে আহরণ করে ন্যায়নীতির বিশেষ প্রভাব-সৃষ্টিকারী ক্ষমতা এবং নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রবল শক্তি।

সমস্ত আলোচনাতেই আমি ন্যায়সঙ্গততার ধারণাটি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ধারণাকে এবং ক্ষতি দ্বারা ন্যায়সঙ্গততা অস্বীকৃত হচ্ছে তেমন ধারণাকে জড়িত করছে এই কথাই বলেছি। তবে এই যে ন্যায়সঙ্গততার ধারণার মধ্যে এগুলো রয়েছে তা ধারণাটির বা ধারণার সাথে জড়িত আবেগটির গঠনের মধ্যে পৃথক উপাদান রূপে রয়েছে তেমনটি না বলে বলেছি যে অন্য আরও দুইটি উপাদানও একটি রূপে এই উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে এই গঠনের মধ্যে আছে। এই অন্য উপাদানগুলো হল একদিকে নির্দিষ্ট কোন ব্যক্তিকে আঘাত করা হয়েছে, আর অন্যদিকে কাউকে শাস্তি প্রদানের দাবী করা হচ্ছে। আমার মতে, আমাদের নিজেদের মনকে পরীক্ষা করলেই আমরা দেখতে পাব যে যখন আমরা বলি যে কোন অধিকারকে অস্বীকার করা হচ্ছে তখন এই দুইটি জিনিসই সেই উক্তির মধ্যে অর্থবোধকভাবে নিহিত থাকে। যখনই আমরা কোন কিছুকে কোন ব্যক্তির অধিকার বলি তখন আমরা এমন বোঝাই যে সেই অধিকার সংরক্ষণ করার বিষয়ে সেই ব্যক্তির সমাজের প্রতি দাবী আছে। আইনের দ্বারা বা নিকা এবং মতামত প্রকাশের দ্বারা সমাজ সেটা সংরক্ষণ করতে বাধ্য। যাকে আমরা যথেষ্ট দাবী বলি তেমন দাবী তাদের আছে বলে যদি আমরা মনে করি, তবে আমাদের বলতেই হবে যে সেটা পাওয়ার অধিকার তার আছে এবং সমাজকে সেটা তাকে দিতেই হবে সেটা যে ভিত্তিতেই হোক-না-কেন। যদি আমরা এমনটা প্রমাণ করতে চাই যে অধিকার হিসেবে তার প্রাপ্য তেমন কিছু নেই বা সমাজের সেই বিষয়ে তাকে

BanglaBook.org

সাহায্য করার কোন নৈতিক কর্তব্য নেই, তবে বরং সেই পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে যাওয়ার ওপর ছেড়ে দিতে হয়, না হয় তার নিজস্ব চেষ্টার উপর ছাড়তে হয়। সেজন্যই একজন ব্যক্তির পেশাগত প্রতিযোগিতায় তার ক্ষমতালব্ধ অর্জনকে তার অধিকার বলে গণ্য করা হয়; কারণ সেই ব্যক্তির এই উপায়ে সাধারণত অর্জনের পথে অন্য কাউকে বাধা প্রদান করতে না দেয়া সমাজের একটি নৈতিক কর্তব্য। তবে কোন ব্যক্তি যদি বছরে তিন শত পাউন্ড অর্জনে সক্ষমও হয় তবুও তার সে-রকম অর্জনের অধিকার থাকে না, কারণ সমাজ তাকে এই অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করতে বাধ্য নয়। অন্যদিকে আবার, যদি শতকরা তিন পাউন্ড হারে তার দশ হাজার পাউন্ডের 'স্টক' (stock) থাকে, তবে সেক্ষেত্রে তার বছরে তিনশত পাউন্ড অর্জনের অধিকার থাকে, কারণ সেই অবস্থায় সমাজের পক্ষে তাকে সেই অঙ্কের অর্থ অর্জনের নিশ্চয়তা প্রদান কর্তব্য হয়ে পড়ে।

আমার ধারণা যে, তাহলে আমার কোন অধিকার থাকা মানেই হল সমাজের কর্তব্য আমার জন্য সেই অধিকার সংরক্ষণ করা। আমাকে যদি কোন আপত্তিকারী বলেন যে তেমনটা সমাজের কর্তব্য কেন হবে, তবে আমি শুধু এমন উত্তর দিতে পারি যে সাধারণ উপযোগিতা ব্যতীত এর আর কোন কারণ নেই। যদি এই উক্তি এই কর্তব্যবোধের শক্তি সম্বন্ধে যথেষ্ট অনুভূতি প্রকাশ করতে ব্যর্থ হয়, অথবা এই অনুভূতির বিশেষ শক্তিকে ব্যাখ্যায়িত করতে ব্যর্থ হয়, তাহলে বলতে হবে যে এই আবেগ গঠনের মধ্যে কেবলমাত্র বুদ্ধিবাদীয় উপাদানই নেই, বরং জীব-বাদীয় উপাদানও রয়েছে—সেটা হল প্রতিশোধের তীব্র ইচ্ছা। এই প্রতিশোধের ইচ্ছার তীব্রতা উদ্ভূত হয় এবং সেটার নৈতিক যৌক্তিকতাও উদ্ভূত হয় এর সাথে জড়িত একটি অসাধারণ এবং প্রভাবশালী শক্তি উপযোগ থেকে। যে-স্বার্থ এর সাথে জড়িত তা হল নিরাপত্তা এবং সকলের জন্যই এটা একটা অধিকতম গুরুত্ব-পূর্ণ একটি স্বার্থ। অন্য আর সকল উপকার একজনের জন্য প্রয়োজনীয় হলেও আরেকজনের জন্য তেমন নাও হতে পারে। অনেকেই আবার প্রয়োজন বোধে একটি উপকার না পেলেও এর পরিবর্তে অপর একটিকে পেলেই খুশী মনে তা মেনে নেয়। কিন্তু নিরাপত্তা এমন একটি বিষয় যা ব্যতীত কোন মানুষই জীবন যাপন করতে পারে না। সকল অশুভ থেকে বাঁচার জন্য এবং সকল ও প্রতিটি শুভের সামগ্রিক মূল্যকে তাৎক্ষণিক মুহূর্তের উর্ধ্বে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের জন্য নিরাপত্তার প্রয়োজন। কারণ যারা সকল সময় আমাদের চেয়ে শক্তিশালী তাদের দ্বারা আমরা যদি সর্বদা সকল কিছু থেকে বিতাড়িত হই তবে আমাদের জন্য শুধমাত্র তাৎক্ষণিক সুখ ব্যতীত আর কিছুই মূল্যবান থাকবে না। এখন

BanglaBook.org

এই যে সকল প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে সেটা সর্বাপেক্ষা অবর্জনীয় জিনিস, সেটা শুধুমাত্র দৈহিক পুষ্টির পরেই স্থান পায়, এটাকে পাওয়া সম্ভব নয় যতক্ষণ পর্যন্ত না এটাকে পাওয়ার উপায়কে সঞ্জাগ রাখা যায়। সুতরাং আমাদের অস্তিত্বের একেবারে ভিত্তি এই নিরাপত্তার জন্য সহসৃষ্টদের প্রতি এই নিরাপত্তাকে টিকিয়ে রাখার যে অসীম দাবী আমাদের রয়েছে সে দাবীটি আমাদের মনে অতিশয় তীব্র আবেগের সৃষ্টি করে। এই আবেগের তীব্রতা অন্যান্য সাধারণ উপযোগের প্রতি আমাদের আবেগের তুলনায় এত অধিক যে এইভাবে সেটা কেবল মাত্রার দিক দিয়েই ভিন্ন হয়ে পড়ে না (যেমন মনোবিদ্যক বিষয়ে এমনটা প্রায়শই দেখা যায়) সেটা আবার যথার্থই অন্য আরেক ধরনের রূপ গ্রহণ করে প্রকারের দিক দিয়েও ভিন্ন হয়ে যায়। এই দাবী তখন এমন এক চরম চরিত্রের রূপ ধারণ করে, যা সঙ্গততা ও অসঙ্গততার অনুভূতির মধ্যেকার পার্থক্যকে সহজ ও সাধারণ অর্থে উপযোগিতা বা অনুপযোগিতার অনুভূতির মধ্যেকার পার্থক্যের বিবেচনার তুলনায় প্রতীয়মান সীমাহীনতা ও তুলনাহীনতার দিক দিয়ে একেবারে চরমভাবে ভিন্ন করে তোলে। যে আবেগ বা অনুভূতি এর সাথে জড়িত রয়েছে তা এতই শক্তিশালী এবং আমরা এই আবেগ অন্যদের (যারা একই স্বার্থবোধে উদ্বুদ্ধ তেমন সত্তা বা প্রাণীদের) মধ্যেও একই আবেগকে জড়িত করবে বলে এত নিশ্চিতভাবেই জানি যে তখন করা উচিত বা করা কর্তব্য এই বিষয়টি অবশ্যকরণীয় কিছুতে রূপ ধারণ করে; এবং স্বীকার্য অবর্জনীয়তা তখন নৈতিক আবশ্যিকতা হয়ে পড়ে; ভৌতিক বা দৈহিক কিছুর সাথে এই অবস্থাকে তুলনা করে বলা যায় যে প্রায়শই এই আবশ্যিকতা প্রাকৃতিক আবশ্যিকতার তুলনায় বন্ধনশক্তির দিক দিয়ে দুর্বল হয় না।

উপরোক্ত বিশ্লেষণটি বা এর মতনই একটা কোন বিশ্লেষণ যদি ন্যায়নীতির সঠিক বিবরণ না হয় — যদি ন্যায়নীতি উপযোগ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন বা স্বাধীন কিছু হয়ে থাকে, এবং যদি নিজেই নিজের (*Per Se*) মানদণ্ড হয়ে থাকে যেটাকে সামান্য অন্তর্দৃষ্টির সাহায্যেই আমাদের মন চিনে নিতে সক্ষম হয়—

তবে এটা বোঝে নেয়া খুবই কষ্টকর হবে যে ঐ অন্তর্নিহিত দৈবিক মহিমা এতই বিভ্রান্তিকর হবে কেন, এবং কেনই বা অনেক কিছুকেই কোন্ আলোকে আমরা দেখছি সেই পরিপ্রেক্ষিতে কখনও ন্যায় বা কখনও অন্যায় বলে ভ্রম হবে।

আমাদেরকে ক্রমাগত বলা হচ্ছে যে উপযোগ একটি অনিশ্চিত মাপকাঠি। কারণ প্রতিটি ব্যক্তি উপযোগের ভিন্ন ভিন্ন ভাষ্য দিয়ে থাকে। একথাও বলা হয় যে, মাপকাঠি হিসেবে ন্যায়নীতির মত নিশ্চত আর কিছুই নেই, ন্যায়নীতির নির্দেশ হল চিরন্তন, নির্মোঘ ও নির্ভুল এবং সেটা নিজের মধ্যেই নিজে সত্যতাকে ধারণ করে ও আমাদের মতামতের তারতম্যের থেকে একেবারেই স্বাধীন। এই সমস্ত কথা থেকে এমনটি বোধ হয় যে ন্যায়নীতির বিষয় নিয়ে কোন বিতর্কের অবকাশই নেই; ন্যায়নীতিকে আমরা যদি নিয়ম বলে মেনে নিই তবে এই নিয়মকে ব্যবহার যে-কোন ক্ষেত্রে করলেই আমরা সন্দেহাতীত অবস্থায় পৌঁছতে পারব, একেবারে যেন আঙ্কিক হিসাবের মতোই সুস্পষ্টভাবে। বাস্তবিক পক্ষে কিন্তু ন্যায়নীতির নির্দেশ সত্যতা থেকে বহু দূরে অবস্থান করেছে। কারণ সমাজের জন্য কি উপযোগী তা নিয়ে যেমন মতাদৈক্য ঘটেছে এবং যে-ধরনের আলোচনা হচ্ছে ঠিক সেই রকমটাই ঘটেছে ন্যায়নীতি নিয়েও। ন্যায়নীতি নিয়ে কেবল যে ভিন্ন ভিন্ন জাতির বা ব্যক্তির মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন ধারণা বিরাজ করছে তা নয়, এমন কি একই ব্যক্তির মনে ন্যায়নীতি বলতে একটি রীতি, নিয়ম, কর্মবিধি বা নীতিকে বোঝায় না। বরং বহু ভিন্ন ভিন্ন কিছুকে বোঝায় যেগুলোর নির্দেশের মধ্যে একটির সাথে অপরটির মিল থাকে না। কোন ব্যক্তিকে সেই-গুলোর মধ্যে একটিকে পছন্দ করে নিতে হলে তাকে কোন অপ্রাসঙ্গিক বাহ্যিক মানদণ্ডের বা তার নিজস্ব ব্যক্তিগত পছন্দের সাহায্য নিতে হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে: কেউ কেউ বলেন যে অন্যদের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যে শাস্তি দেয়া অন্যায়, কারণ শাস্তি প্রদান একমাত্র ন্যায্য হবে তখনই যখন এর উদ্দেশ্যে হবে যে-ব্যক্তি অপরাধ করেছে তার মঙ্গল সাধন। অন্যরা আবার সম্পূর্ণ বিপরীত মত পোষণ করে বলেন যে, শুধুমাত্র নিজেদের উপকারের জন্য যাদের ন্যায়-অন্যায় বোধের ক্ষমতা আছে তেমন ব্যক্তিদের শাস্তি দেয়া হলে সেটা অন্যায় এবং স্বেচ্ছাচার হয়ে পড়ে। কারণ যদি শুধুমাত্র তাদের নিজেদের মঙ্গলই বিবেচনার বিষয় হয় তবে তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে তারা নিজেরা ব্যতীত অন্য কারো ভাববার অধিকারই নেই। বরং অন্যদের প্রতি যাতে তারা আর অন্যায় সাধন করতে না পারে সেই বিবেচনায়ই তাদেরকে শাস্তি দেয়া ন্যায় কাজ হতে পারে। এই ক্ষেত্রে আত্মরক্ষার আইনগত অধিকারের

BanglaBook.org

আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। মিস্টার ওয়েন (Mr. Owen)[৩] আবার বলছেন যে শাস্তি প্রদান ব্যাপারটাই নৈতিকভাবে অন্যায়। কারণ কোন অপরাধী নিজের চরিত্রকে নিজে গঠন করে না। তার চরিত্র গঠিত হয় তার শিক্ষা ও তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ দ্বারা। সে ঐ সকল প্রভাবের ফলেই একজন অপরাধী হয়ে যায়। সেই কারণে এই ব্যাপারে তার নিজস্ব কোন দায়িত্ব থাকতে পারে না। এগুলোর সব কয়টি মতামতেরই অত্যন্ত অধিক সম্ভাব্যতা রয়েছে। ন্যায়নীতির ভিত্তিস্বরূপ নীতিসমূহের বিবেচনা এবং ন্যায়নীতির কর্তৃত্বের উৎসের বিবেচনা ব্যতিরেকে সরলভাবে শুধুমাত্র ন্যায়নীতি বলতে কি বোঝায় এই প্রশ্ন নিয়ে বিতর্কে আমার পক্ষে এই সকল মতামত পোষণকারী কারো মতকেই খণ্ডন করা সম্ভব নয়। কারণ এইতিনটি মতের প্রতিটি যথার্থই এমন সকল ন্যায়নীতির নিয়মের উপর ভিত্তিশীল বা স্বীকৃত সত্য। প্রথমটি একজন ব্যক্তিকে তার নিজস্ব মত প্রদান ছাড়াই অন্যান্যদের উপকারের উদ্দেশ্যে বিসর্জন করার স্বীকৃত অন্যায়ের প্রতি আবেদন রাখা হচ্ছে। দ্বিতীয়টি আত্মরক্ষার স্বীকৃত ন্যায়নীতির উপর এবং অন্য আরেক জনের মনে কি তার নিজের জন্য মঙ্গলময় হবে সেই ধারণাকে মেনে নিতে বাধ্য করানোর স্বীকৃত ন্যায়নীতির উপর বিশ্বাস স্থাপন করছে। ওয়েনবাদীরা (The Owenites) [তৃতীয়টি] যে-সকল বিষয়ে ব্যক্তির নিজের কোন স্বাধীনতা নেই [অর্থাৎ সে ইচ্ছা করলে নিজের জন্য অন্য প্রকারের চরিত্র গঠন করতে সক্ষম নয়] সে সকল বিষয়ে তাকে শাস্তি দেয়া অন্যায় এই নীতির উপর গুরুত্ব প্রদান করছেন। এই প্রতিটি মতবাদে বিশ্বাসী ব্যক্তিই নিজের মতো বিজয়ী হতে পারেন যতক্ষণ পর্যন্ত না তাকে ন্যায়নীতির অন্য কোন নিয়মকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা না হয়। কিন্তু যখনই কয়েকটি নীতিকে সামনাসামনি তুলে ধরা হয় তখনই প্রতিটি বিবাদীর পক্ষে ঠিক অন্যদের যা বক্তব্য আছে তেমন শক্তিশালী বক্তব্য উপস্থাপন করা সম্ভব হয়ে পড়ে। কেউই অন্যদের একই মাত্রার শক্তিশালী ধারণাগুলোকে পূর্ণ শক্তি দিয়ে ভেঙ্গে চুরমার না করে দিয়ে তাঁর নিজস্ব ন্যায়নীতির ধারণাটিকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন না। এগুলোই হল যথার্থ অসুবিধা। সকলেই এই অসুবিধাগুলোকে খণ্ডন করার চেষ্টা না করে বরং এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টায়ই ব্যস্ত রয়েছেন। তিনটি মতবাদের শেষ মতবাদটিকে পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ আবার ইচ্ছার স্বাধীনতা বলে একটি বিষয়কে করনা করে নিচ্ছেন—ভাগ্যিস যে এঁরা ইচ্ছা সম্পূর্ণভাবে ঘৃণিত অবস্থায় যাদের মনে বিরাজ

৩. ব্রিটিশ সমাজ-সংস্কারক Robert Owen (1771-1858) তাঁর ***A New View of Society*** গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

BanglaBook.org

করছে তাদেরকে শাস্তি দেয়া ন্যায় এমন কথা এখন পর্যন্ত বলতে পারছেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না সম্মুখস্থ পরিবেশের প্রভাবের কারণে সেই ধরনের ইচ্ছা তাদের মনে সৃষ্টি হয়েছে বলে অনুমান করতে পারছেন। অন্যান্য অসুবিধা থেকে বাঁচার উপায় হিসেবে একটি পছন্দনীয় কৌশল হল চুক্তি। কোন এক অজানা কালে এই চুক্তি অনুযায়ী সমাজের সকল সদস্য স্থির করেছিল যে তারা সকলেই আইন মেনে চলবে এবং যারা আইন মেনে চলবে না তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। এইভাবে তাদের আইন প্রণয়নকারীদের এমন অধিকার দেয়া হয়েছে যে, অধিকার দেয়া হয়েছে অনুমান করে নিতে হবে না হলে তাদের তেমন অধিকার থাকতো না, সকলকে হয় তাদের নিজেদের মঙ্গলের জন্য বা সমাজের মঙ্গলের জন্য তাঁরা শাস্তি প্রদান করতে পারবেন। এটা নিশ্চিত যে, এইভাবে যে সমস্ত অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টিকে আইনসঙ্গত করা যায় বলে বিবেচিত হয়েছে এখানে অবশ্য অপর একটি গৃহীত ন্যায়নীতির সাহায্য নেয়া হয়েছে—কোন কাজ দ্বারা কোন ব্যক্তি কষ্ট পেতে পারে তেমন অনুমান করা হলেও সেটা সম্পাদনের বিষয়ে সেই ব্যক্তির নিজস্ব অনুমোদন থাকলে সেই কাজ সম্পাদন অন্যায় হয় না। এখানে আমার মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন যে, যদি মত প্রদান করা একটি কাল্পনিক ব্যাপার না হয়েও থাকে, তবু এই যে নীতি এটা কোনভাবেই অন্যগুলোর চেয়ে কর্তৃত্বের দিক দিয়ে তেমন উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন নয় যার দ্বারা এটা অন্যগুলোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যেতে সক্ষম হবে। বরং এমন বলা যায় যে, এটা তেমন একটি পদ্ধতির একটি প্রদর্শনীয় দৃষ্টান্ত যার দ্বারা যুক্তিবিহীন ও অনিয়মতান্ত্রিকভাবে তথাকথিত ন্যায়নীতির নীতিগুলো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। এই বিশেষ নীতিটি আইনের বিচারালয়ের স্থূল আবস্থানিক প্রয়োজনে সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যে-প্রয়োজনকে অনেক সময় অনিশ্চিত অনুমান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয় এই কারণে যে অন্যথায় হয়ত বৃহত্তর ক্ষতিকর কিছু ঘটার সম্ভাবনা থাকতে পারে। কিন্তু আইনের বিচারালয়ও এই নীতিটিকে সর্বক্ষেত্রে সর্বদাই মেনে চলতে পারে না, কারণ ঐচ্ছিক অনুমোদনকেও আইনের বিচারক কখনও কখনও ভাঁওতা বলে মেনে নেয় এবং অনেক সময় আবার ভুল বা ভুল তথ্য আখা দিয়ে সেগুলোকে বাতিল করে দেয়।

আবার, শাস্তি প্রদানের আইনসঙ্গততাকে মেনে নেয়া হলেও অপরাধের পরিমাণে শাস্তির মাত্রা যে কতটুকু হলে সঠিক হবে সে বিষয়ে বিবেচনা করতে গিয়েও নানা প্রকারের বিপরীতধর্মী ন্যায়নীতির ধারণাগুলো বিবেচনার মধ্যে আসে। এই বিষয়ের

BanglaBook.org

কোন নিয়মই 'চক্ষুর বদলে চক্ষু' ও 'দন্তের বদলে দন্ত' ন্যায়নীতির এই আদিম ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের মত নিজের জন্য অত্যধিক দৃঢ়তার সাথে সুপারিশ করে না। এই ইহুদীয় ও মহাম্মদীয় নীতিটি যদিও সাধারণভাবে ইউরোপীয় বিশ্বে ব্যবহারিক নীতি রূপে বর্জিত হয়েছে, তবুও আমি ব্যক্তিগতভাবে সন্দেহ পোষণ করি যে সেখানেও অনেকের মনের গহনে এই নীতিটিকে অনুসরণের আকাঙ্ক্ষা বিরাজ করছে। যখন হঠাৎ করেই কোন অপরাধীর প্রতি প্রতিশোধাত্মক কিছু কোন কিছুর বদলা হিসেবে ঘটে যায় তখন সাধারণ সন্তুষ্টির উপস্থিতি ঘটে এবং এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে সঠিক অর্থে বদলা নেয়া বা প্রতিশোধ নেয়া স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণীয়। অনেকের মতেই শাস্তি প্রদানের বিষয়ে ন্যায়বোধের পরীক্ষা হল এই যে অপরাধ অনুযায়ী শাস্তি বিধান, অর্থাৎ দোষীর নৈতিক অপরাধের সঠিক মাপ বা পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তি দেয়া উচিত (সেই পরিমাণ যাচাইয়ের মাপকাঠি যাই-হোক না-কেন)। এদের মতে অপরাধকে প্রতিরোধ করার বিবেচনাটি ন্যায়নীতির প্রশ্নের সাথে কোনক্রমেই জড়িত নয়। অন্য অনেকের ধারণায় আবার এই বিবেচনাটিই সর্বেসর্বা। তাদের মতে মানুষের পক্ষে অন্তত এমন শাস্তি তার সহসৃষ্টির প্রতি বিধান করা কখনও উচিত নয় যা পরিমাণে যতটুকু দ্বারা অপরাধীকে পুনর্বার অপরাধ করা থেকে বিরত রাখা যাবে এবং অপরকে একই অপরাধ করে তাকে অনুসরণ করা থেকে বিরত রাখা যাবে তার থেকে অধিক হবে।

ইতিপূর্বেই যে-নিয়মটি সম্বন্ধে বলা হয়েছে তার থেকে একটা উদাহরণ দেয়া যাক। একটি সমবায় শিল্প সমিতির কোন এক সদস্যকে তার নিজস্ব যোগ্যতা ও মেধার বিচারে অধিক পারিশ্রমিক দেয়া কি ন্যায় না অন্যায়? প্রশ্নটির নেতিবাচক দিকটি বিবেচনা করে কেউ কেউ বলেন যে, যারা উত্তম কাজ করার যোগ্য এবং অধিক উৎপাদনশীল তাদের অন্য সকলের মত একই সমান ফলই প্রাপ্য, কারণ অন্য সকলে তাদের নিজেদের কোন জ্ঞাত ত্রুটির অনুপস্থিতিতে নিম্নতর অবস্থায় থাকবে সেটা নৈতিক বিবেচনায় ন্যায় হবে না। তারা আরো বলেন যে, যারা মেধা ও যোগ্যতায় উচ্চ স্থানীয় তারা এমনিতেই, অর্থাৎ তাদের জন্য আবার পাথিব পাওয়া যুক্ত না করা হলেও, নানা প্রকারের সুবিধা পাচ্ছে, যথা, অন্যদের মনে তাদের প্রতি সম্প্রশংস উপলব্ধি সৃষ্টি হয় এবং এইভাবে তাদের পক্ষে ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তার করা সম্ভবপর হয়। যারা মেধা ও যোগ্যতায় নিম্ন স্থানীয় তাদের প্রতি তাদের অসম যোগ্যতার ক্ষতিপূরণ হিসেবে সমাজের পক্ষে এই অসাম্যকে বৃদ্ধি না করে বরং তাদের জন্য নানা প্রকারের অধিক সুবিধা প্রদান করা উচিত হবে। অন্য দিকে আবার এমনও মনে করা হয় যে, যারা অধিক

BanglaBook.org

শ্রমশীল তাদের নিকট থেকে সমাজ অধিক লাভবান হয় এবং যেহেতু সার্বিক কর্মকাণ্ডের ফলাফলের অধিক অংশ তাদের শ্রমের ফল যেহেতু তাদেরকে অধিক অংশ না প্রদান করা অনেকটা ডাকাতি করারই মতন। আরও বলা হয় যে, যদি তাদেরকে অন্য সকলের সমান অংশ দেয়া হয় তবে তারা ন্যায়তভাবেই ঠিক যেটুকু পাচ্ছে সেটুকুই উৎপাদন করবে এবং তাতে তাদের উচ্চ মানের কর্মশক্তি নিয়ে অল্প সময় ও শ্রম দিলেই হবে। এখন এই ন্যায়পরতার দুইটি বিপরীতধর্মী নীতির মধ্যে কোনটি সার্বিক সে বিষয়টি কে স্থির করবে? এই ক্ষেত্রে ন্যায়নীতির দুইটি দিক আছে, সেগুলোর মধ্যে ঐকতানিক সমন্বয় সৃষ্টি করা একটি অসম্ভব বিষয়, এবং দুইটি বিবাদী দল বিপরীত মতবাদ পোষণের দায়িত্ব নিয়েছে। একটি দল বলছে একটি ব্যক্তির পক্ষে ন্যায়ত কি পরিমাণের পারিশ্রমিক প্রাপ্য, এবং অন্য দলটি বলছে জনগোষ্ঠীর পক্ষে কতটুকু ন্যায়ত দেয়। এদের নিজস্ব প্রেক্ষিত বিবেচনায় প্রত্যেকেই উত্তর প্রদানের অযোগ্য; এবং দুই দলের মধ্যে একটির মতকে ন্যায়নীতির ভিত্তিতে পছন্দ করে নেয়ার বিষয়টি একেবারে স্বেচ্ছাচারী। এই পছন্দের ব্যাপারটা নিয়ে সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব কেবলমাত্র সামাজিক উপযোগিতার বিবেচনায়।

আবার কর আদায়সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়েও কত যে বিভিন্ন এবং বিরোধী ন্যায়নীতির মানদণ্ডের প্রতি ইঙ্গিত দেয়া হয়ে থাকে। একটি মত হল, আর্থিক অবস্থার আঙ্কিক বা সাংখ্যিক অনুপাতে রাষ্ট্রকে কর প্রদান করাই উচিত। অন্যদের মত হল, ন্যায়নীতির নির্দেশ হল, তাঁরা যাকে বলেন স্নাতকীকরণ (graduated) কর—যাদের পক্ষে বেশী কর দেয়া সম্ভব তাদের নিকট থেকে শতকরা উচ্চতর হারে কর আদায় করা। প্রাকৃতিক ন্যায়বিচারের প্রেক্ষিতে আর্থিক অবস্থাকে বিবেচনার মধ্যে একেবারে না এনে সকলের নিকট থেকেই একেবারে সমান অঙ্কের অর্থ আদায় করা উচিত (যখনই তেমনটা আদায় করা সম্ভব), যেমনটা আদায় করা হয়ে থাকে মেসে বসবাসকারীদের বা ক্লাব বা সমিতির সদস্যদের থেকে একই ধরনের সুবিধা দানের বদলে, সকলের আর্থিক অবস্থা সমান হোক আর না-ই হোক। যেহেতু আইন ও সরকার সকলকে সমানভাবে রক্ষা করে ('রক্ষা' করাই বলা যেতে পারে) এবং সকলেরই একই রকম এই ধরনের নিরাপত্তার প্রয়োজন পড়ে, সেহেতু এইসব সুবিধার জন্য সকলকেই যে সমান পরিমাণের মূল্য দিতে হবে সে-বিষয়ে ন্যায়নীতির কোনরূপ অন্যথা হওয়ার কথা নয়। যখন কোন বিক্রেতা ক্রেতার আর্থিক ক্ষমতা অনুসারে মূল্যের তারতম্য না করে সকল ক্রেতার নিকট সমান মূল্যে একই জিনিস বিক্রয় করে তখন সেটা ন্যায় বলেই স্বীকৃত হয়, সেটাকে অন্যায় বলা হয়

BanglaBook.org

না। কিন্তু কর আদায়ের ব্যাপারে এই একই মতবাদ আরোপ করা হলে সেটা গ্রহণ করবে তেমন ব্যক্তি পাওয়া যাবে না। কারণ এই অবস্থাটি মানুষের মানবিক অনুভূতি ও সামাজিক সুবিধাজনকতার ধারণাগুলোর সাথে অত্যন্ত উগ্রভাবে বিরোধিতা করে। কিন্তু ন্যায়পরতার যে-নীতিটি এই অবস্থার সাথে জড়িত সেটা যথার্থই সঠিক, এবং এই নীতির বন্ধন-শক্তিও অন্যান্য বিরোধী নীতিগুলোর সেই শক্তির চেয়ে কোনক্রমেই দুর্বল নয়। তবুও কিন্তু এই নীতিটি প্রত্যক্ষভাবে অন্যান্য কর নির্ধারণ পদ্ধতির উপর প্রভাব বিস্তার করে আপত্তি খণ্ডনের জন্য প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে। লোকেরা তখন এই ধরণের যুক্তির অবতারণা করে যে, রাষ্ট্র সর্বদাই দরিদ্রের চেয়ে ধনীদের পক্ষে থাকে এবং সেটাই ধনীদের নিকট থেকে অধিকতর কর আদায়ের যৌক্তিকতা। তবে একথা মোটেও সত্যি নয়। কারণ আইন বা সরকারের অনুপস্থিতিতে ধনীরা দরিদ্রের অপেক্ষা আত্মরক্ষা করতে অধিকতর সক্ষম এবং যথার্থই সম্ভবত সেই অবস্থায় দরিদ্রদের তারা একেবারে দাসে পরিণত করতে সক্ষম হবে। আবার আরেক দল লোক ন্যায়-নীতি সম্বন্ধে এতই ভিন্ন মতাবলম্বী যে তারা মনে করে, ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য সকলকে সমান মাথাপিছু (capitation) কর দিতে হবে (কারণ ব্যক্তিগত নিরাপত্তা সকল ব্যক্তির জন্য সমান প্রয়োজনীয়), এবং সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য অসম কর দিতে হবে কারণ সকলের সমপরিমাণের সম্পত্তি নেই। এই মতের বিরুদ্ধে আবার আরেক দল লোক বলে যে একজন ব্যক্তির সামান্য যা কিছুই আছে তা সার্বিকভাবে তার কাছে যেমন মূল্যবান আরেক জন ব্যক্তির অধিক যা কিছু আছে তা সার্বিকভাবে তার কাছেও তেমন সমানই মূল্যবান। এই সকল বহুবিধ মতবাদের বিভ্রান্তি থেকে মুক্তি পাবার একমাত্র উপায়ই হল উপযোগবাদ।

এবার তাহলে কি বলা যায় যে, ন্যায়পরায়ণতা ও সুবিধাবাদিতার মধ্যে যে-পার্থক্য আছে বলে মনে করা হয় তা শুধুমাত্র কাল্পনিক ব্যাপার? তাহলে কি বলবো মানব জাতি এমন বিভ্রান্তির মধ্যে বাস করছে যে তারা ন্যায়নীতিকে চাতুর্যের চেয়ে অনেক পবিত্র বলে মনে করে, এবং মনে করে যে প্রথমটিকে মেনে নিলেই তবে পরবর্তীটি সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা করা সম্ভব হয়? তেমন কিন্তু মোটেও নয়। ন্যায়নীতির আবেগটির প্রকৃতি এবং উৎস সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বেই দেয়া হয়েছে তাতে সম্পূর্ণভাবে এগুলোর মধ্যে একটা যথার্থ পার্থক্যকে স্বীকার করা হয়েছে। আমি স্বয়ং যেভাবে এই পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে কার্যকলাপের নৈতিকতাকে মূল্যায়ন করতে এই পার্থক্যকে একটি প্রধান উপাদান হিসেবে দেখি সে রকমটি আর কেউ বোধ হয় করেন না। যে-মতবাদ ন্যায়নীতি উপযোগের উপর

BanglaBook.org

ভিত্তিশীল নয় তেমন একটি কল্পনাপ্রসূত মানদণ্ডকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম বলে মনে করে সেটাকে খণ্ডন করতেও যেমন আমি চেষ্টা করছি, ঠিক তেমন একই-ভাবে আমি এমনও বলি যে উপযোগবাদের উপর ভিত্তিশীল ন্যায়নীতিই হল সকল নৈতিকতার একটি প্রধান অংশ এবং সকল নৈতিকতার মধ্যে একটি অতুলনীয়ভাবে সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও বন্ধন-শক্তিসম্পন্ন অংশ। ন্যায়নীতি হল সেই সকল নৈতিক নিয়ম যে শ্রেণীভুক্ত সেই শ্রেণীরই নাম, যা মানব কল্যাণের সাথে সর্বাপেক্ষা নৈকট্যে আবশ্যিকরূপে অবস্থান করছে, এবং সেই কারণেই জীবন যাপনের পথে পথপ্রদর্শক অন্যান্য নিয়মের তুলনায় এই শ্রেণীভুক্ত সকল নৈতিক নিয়মের বন্ধন শক্তি অধিকতর চূড়ান্ত। ন্যায়নীতির ধারণার গুরুত্ব হিসেবে যে-ধারণাটিকে আমরা পেয়েছি—ব্যক্তির মনের মধ্যেই অধিকার বোধ বাস করছে—সেটা এই বাধ্যতাবোধের অধিকতর বন্ধনশক্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয় এবং সত্যতা প্রদর্শন করে।

যে-সকল নৈতিক নিয়ম মানব জাতিকে একে অপরকে আঘাত প্রদান করতে নিষেধ করে (এর মধ্যে অবশ্যই কখনও আমরা একে অপরের স্বাধীনতা খর্ব করার বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়টি ভুলে যাব না) সেইগুলো মানব কল্যাণের জন্য অন্যান্য নীতির চেয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। অন্যান্য নীতিগুলো শুধু-মাত্র মানব জীবনের কোন কোন বিভাগ কি কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব সে ব্যাপারেই নির্দেশ দেয়। কিন্তু শুধুমাত্র এই নীতিগুলো পালন করলেই মানব সমাজে শান্তি রক্ষা করা সম্ভব হয়। যদি এই নিয়মগুলোকে মেনে চলা রীতি না হত এবং না মেনে চলা ব্যতিক্রমী না হত, তবে প্রত্যেকেই প্রত্যেককে শত্রু মনে করে সর্বক্ষণ নিজেকে পাহারা দিয়ে রাখতো। এই তথ্য মোটেও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় যে এইগুলো তেমন ধারণা যা মানব জাতির মধ্যে শক্তিশালীরূপে বিরাজ করছে এবং এগুলোই হল সর্বাধিকভাবে প্রত্যক্ষ চালকশক্তি যার দ্বারা একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছে। কেবলমাত্র একজন অপরজনকে দূরদর্শী নির্দেশ দিয়ে বা উৎসাহ প্রদান করে মানুষ লাভবান হতে পারে না, অথবা মানুষেরা মনে করে যে তারা মোটেও লাভবান হচ্ছে না। মানুষ একজন অপরজনের উপর প্রভাব বিস্তার করার বিষয়টিকে একটি নিশ্চিত উপকার বলে মনে করে বলেই মানুষের এই বিষয়ে আগ্রহের অভাব নেই, তবে এই আগ্রহের মাত্রা অধিক নয়। কারণ কোন ব্যক্তির অন্যের দ্বারা উপকৃত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা না-ও থাকতে পারে; তবে অন্য কেউ তার ক্ষতি না করুক, সেটা তার পক্ষে সর্বদাই প্রয়োজনীয়। এইভাবে প্রতিটি ব্যক্তিকে যে

BanglaBook.org

নৈতিকতা অপরের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে, প্রত্যক্ষভাবেই হোক বা তার নিজস্ব কল্যাণের পথে বাধা সৃষ্টি না করেই হোক, সেই নৈতিকতাকেই সে ব্যক্তি তার নিজের মনে লালন করবে এবং কথায় ও কাজে অতি শক্তিশালী আগ্রহের সাথে সেটাকে প্রকাশ করতে ও সেঅনুসারে চলাকে কার্যকরী করতে সে সদা চেষ্টা করবে। একজন ব্যক্তির এই নৈতিকতা মেনে চলার বিষয়টি বিবেচনা করার পরই তাকে মানব জাতির অন্যতম সদস্য হিসেবে তার যোগ্যতা বিচার করা হয় ও সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর উপরই নির্ভর করে সে যাদের সাথে সহঅবস্থান করছে তাদের জন্য সে বিরক্তিভাজন কিনা সেই বিবেচনাটিও। এখন এই নৈতিকতাই হল যা মুখ্যভাবে ন্যায়নীতির বাধ্যতাবোধকে গঠন করে। অন্যায়ের সর্বাধিক জলন্ত দৃষ্টান্ত সেইগুলোই যার দ্বারা কারো উপর অন্যায়ভাবে শক্তি আরোপ করা হয় অথবা অন্যায় অত্যাচার করা হয়, এবং এগুলোই নৈতিক আবেগের সাথে বিশেষভাবে জড়িত ঘৃণার অনুভূতিকেও জাগ্রত করে। এই দৃষ্টান্তটির পর যা বলা যায় তা হল অন্যায়ভাবে কারো প্রাপ্য কিছু থেকে তাকে বঞ্চিত করা। তবে এই উভয় ক্ষেত্রেই কোন ব্যক্তির প্রতি নিশ্চিত ক্ষতি করা হচ্ছে, হয় প্রত্যক্ষভাবে তাকে কষ্ট দিয়ে অথবা তাকে সে সঙ্গতভাবে যা পেতে পারে তা থেকে বঞ্চিত করে, সেটা ভৌতিক হতে পারে অথবা সামাজিক কিছুও হতে পারে।

এই মুখ্য নৈতিকতা মেনে চলার প্রতি নির্দেশ দেয় যে শক্তিশালী উদ্দেশ্য সেটাই আবার এই নৈতিকতাকে অমান্য করার জন্য শাস্তি প্রদানের বিষয়টির সাথেও জড়িত হয়ে আছে। আত্মরক্ষার স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা ও অন্যদের রক্ষা করা ও অন্যদের প্রতিশোধ নেয়া এই সকল ইচ্ছাগুলোই অমান্যকারীর প্রতি চালিত হয় এবং এইভাবে মন্দ কাজের মন্দ ফল পাওয়া বা প্রতিশোধ নেয়ার বিষয়গুলোও ন্যায়নীতির আবেগের সাথে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং সার্বজনীনভাবে ধারণাটির অন্তর্ভুক্ত হয়। ভাল কাজের ভাল ফল পাওয়ার ব্যাপারটাও ন্যায়-নীতির একটি অন্যতম নির্দেশ। যদিও এর সামাজিক উপযোগ সুস্পষ্ট এবং যদিও স্বাভাবিক মানবসুলভ অনুভূতি এর সাথে জড়িত রয়েছে, এবং সর্বাপেক্ষা মৌলিক ন্যায় ও অন্যায়ের ক্ষেত্রে অস্তিত্বশীল ক্ষতি বা আঘাতের সাথে যে এটা সম্পৃক্ত সে তথ্য যদিও প্রথম দর্শনে ধরা পড়ে না, তথাপিও কিন্তু এই নীতিটিই হল আবেগটির চারিত্রিক তীব্রতার একটি উৎস। তবে এই সংযোগটি তত সুস্পষ্ট না হলেও কিন্তু অসত্য নয় বা অবাস্তবও নয়। যে-ব্যক্তি উপকার গ্রহণ করে কিন্তু তার বদলে যখন উপকার করা প্রয়োজনীয় হয় তখন তা করে না, সে ব্যক্তি যথার্থই

BanglaBook.org

স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত আশা ভঙ্গ করে অন্যের মনে দুঃখ বা বেদনার সৃষ্টি করে। তার নিকট থেকে যে উপকার আশা করা যেতে পারে তেমন পরোক্ষ ইঙ্গিত সে দেয় বলেই কিন্তু সে উপকার পায়, নয়ত সে নিজে কদাচিৎ কোন উপকার পেত। মানব অশুভ ও অন্যায়ের মধ্যে আশাভঙ্গের গুরুত্বপূর্ণ স্থান এই বাস্তব অবস্থার মধ্যে প্রদর্শন সম্ভব যে এটা দুটি অত্যন্ত উচ্চ মাত্রায় অনৈতিক কাজের মধ্যেকার প্রধান অপরাধত্বকে গঠন করে। অনৈতিক কাজগুলো হল প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করা ও বন্ধুত্বের অমর্যাদা করা। প্রয়োজনের সময় যার নিকট থেকে অভ্যাসগতভাবে এবং পূর্ণ নিশ্চয়তার সাথে কোন মানুষ সাহায্য পাওয়া যাবে বলে আশা করে তার নিকট থেকে তেমনটি না পায়, তবে মানুষের জন্য এই অবস্থার চেয়ে অধিকতর আঘাত এবং অধিকতর ক্ষতের কারণ আর কিছুই হতে পারে না। কল্যাণ থেকে এভাবে বঞ্চিত করার মত অন্যায় কাজ খুব কমই আছে। যে-ব্যক্তি এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার মনে বা সমব্যথী দর্শকের মনে এই অবস্থার চেয়ে অধিক তিক্ততা আর কোন অবস্থাই সৃষ্টি করে না। সুতরাং, যার যা প্রাপ্য তাকে তা দেয়ার যে নীতি, অর্থাৎ ভালর জন্য ভাল আর মন্দের জন্য মন্দ এই নীতি ন্যায়নীতির ধারণাটিকে আমরা যেভাবে সংজ্ঞায়িত করি তার মধ্যে শুধুমাত্র অন্তর্ভুক্তই নয়। বরং এটাই হল সেই আবেগটির তীব্রতার যথোপযুক্ত বিষয়বস্তু, যে-আবেগটি মানব বিচারে ন্যায়কে সরল সুবিধার চেয়ে অনেক উপরে স্থান দেয়।

সমকালীন বিশ্বে প্রচলিত এবং সাধারণভাবে কার্যকলাপের মধ্যে গৃহীত ন্যায়-নীতির প্রায় সকল নীতিমালাই হল একমাত্র আমরা ন্যায়নীতির যে নীতিগুলোর কথা বলেছি সেইগুলোকে কার্যকরী করার জন্য শুধু সহায়ক পদ্ধতি মাত্র। কোন ব্যক্তি ঐচ্ছিকভাবে যা করে বা যা ঐচ্ছিকভাবে এড়িয়ে যেতে পারে তার জন্যই শুধু সে দায়ী, কোন ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করা অন্যায়, শাস্তিকে অপরাধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া উচিত, এবং এই ধরনের আরও অন্যান্য নীতি হল এমন নীতি যেগুলোর অভিপ্রায় হল মন্দের জন্য মন্দ এই ন্যায়নীতিটি প্রবর্তন করতে গিয়ে অযৌক্তিকভাবে মন্দকে সৃষ্টি করার পথে বাধা দান করা। এই সাধারণ নীতিমালার অধিকাংশই আইনের বিচারালয়ে সেই সকল নিয়ম, যে-সকল নিয়ম তাদের স্বৈত ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে সক্ষম করেছে—যে-ক্ষেত্রে শাস্তি প্রাপ্য সেক্ষেত্রে শাস্তি প্রদান এবং যার যে অধিকার আছে তাকে সে অধিকার প্রদান, এই সকল নিয়ম ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে স্থান লাভ করেছে। এই কারণেই স্বাভাবিকভাবেই এগুলো সম্পূর্ণ স্বীকৃতি এবং ব্যাপকতা অর্জন করেছে, যেমনটা অন্য উপায়ে সম্ভব হত না।

BanglaBook.org

**আইনগত** সদগুণের মধ্যে প্রথম হল পক্ষপাতহীনতা এবং এই গুণটি হল ন্যায়-নীতির জন্য একটি বাধ্যতামূলক গুণ, এবং আংশিকভাবে উপরে উল্লেখিত কারণে ন্যায়নীতির অন্যান্য বাধ্যতামূলক উপাদানকে বাস্তবায়িত করার জন্য এটা একটি আবশ্যিক শর্ত। তবে মানব কর্তব্যবোধের মধ্যে এটাই কিন্তু সাম্য ও পক্ষপাতহীনতা নীতির মতো উচ্চ স্তরের নীতিমালার একমাত্র উৎস নয়, যেটাকে সাধারণ মানুষের বিচারে এবং অত্যন্ত আলোকপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বিচারে ন্যায়নীতির নির্দেশাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক দিক দিয়ে কিন্তু এগুলোকে আবার ইতিমধ্যেই যে-সকল নীতি প্রণয়ন করা হয়েছে সেগুলোর অনুসিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে। যদি প্রত্যেককেই তার প্রাপ্য অনুযায়ী দেয়া হয় এবং মন্দকে মন্দ দ্বারাই স্তব্ধ করা হয়, তবে এ থেকে আবশ্যিকভাবেই এমনটাই দাঁড়ায় যে আমরা তাকে তেমনভাবেই দেখবো (যখন সে-পথে কোন উচ্চতম কর্তব্য বাধা না হয়ে দাঁড়ায়) যার **আমাদের কাছ থেকে** যেমন ব্যবহারই প্রাপ্য, এবং সমাজ তার প্রতি তেমন ব্যবহারই করবে যার **সমাজের কাছ থেকে** যেমন ব্যবহার প্রাপ্য, অর্থাৎ চূড়ান্তভাবে যার যেমন প্রাপ্য তার প্রতি তেমন ব্যবহারই করা হবে। এটা হল সামাজিক এবং বিভাজক (distributive) ন্যায়নীতির জন্য একটি সর্বোচ্চ বিমূর্ত আদর্শ, সেই আদর্শ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল সদগুণসম্পন্ন নাগরিকের প্রচেষ্টাকে যথাসম্ভব উচ্চ মাত্রায় ক্রিয়াশীল করে তোলা উচিত। কিন্তু এই মহৎ নৈতিক কর্তব্য আরেকটি গভীর ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত, এটা কোন গৌণ বা অনুবর্তী (derivative) মতবাদের একটি যৌক্তিক অনুসিদ্ধান্ত মাত্রই নয়। এটা একেবারে উপযোগ বা অধিকতম আনন্দ নীতিটির অর্থের সাথে নিবিড়ভাবে জড়িত। ঐ মতবাদটি কোন অর্থবিহীন শুধুমাত্র কয়েকটি শব্দ দ্বারা সৃষ্ট একটি আকার ভিন্ন আর কিছুই হত না, যদি না একজন ব্যক্তির আনন্দকে অন্য যে-কোন আরেক জন ব্যক্তির আনন্দের সমান বলে গণ্য করা না হত, সেই আনন্দের মাত্রা একই পরিমাণের হবে বলে অনুমান করে নেয়া যাক (ভিন্ন ধরনের আনন্দের বিবেচনাকেও এখানে স্থান দিতে হবে)। এই শেষ শর্ত মেনে নিলে বেনথামের "প্রত্যেককে একজন [বা একটি একক] বলে গণনা করতে হবে এবং কাউকেই একাধিক বলে গণনা করা যাবে না" এই নীতিকে উপযোগ নীতির নীচে একটি ব্যাখ্যাকরণ মন্তব্যরূপে উল্লেখ করা যাবে।[৪] নীতিবিদ ও আইন প্রণয়নকারীদের বিবেচনায় আনন্দের উপর সকলের সমান দাবী আবার আনন্দের মাধ্যমের উপর সমান দাবীকেও জড়িত করছে, যেগুলো মানব জীবনের জন্য এবং প্রতিটি ব্যক্তির স্বার্থ-সম্বলিত সাধারণের স্বার্থের জন্য অপরিহার্য তেমন

৪. দেখুন, Herbert Spencer-এর গ্রন্থ ***Social Statics***.

BanglaBook.org

কোন শর্ত যখন এই নীতি পালনের পথে বাধা না হয়ে দাঁড়ায়, এবং ঐ বাধাগুলোকেও সঠিকভাবে বুঝে নিতে হবে। প্রত্যেক ব্যক্তির সমানভাবে ব্যবহার পাবার অধিকার আছে বলে মেনে নিতে হবে, কেবলমাত্র যখন সামাজিক সুবিধা রক্ষার্থে তেমনটা হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় বলে মনে করা হবে তখন ছাড়া। সে কারণে যে-সকল সামাজিক অসাম্যকে আর সুবিধাজনক মনে হয় না সেগুলো সরলভাবে অসুবিধাজনক রূপ ধারণ না করে অন্যায়ের রূপ ধারণ করে, এবং এমন অধিক মাত্রায় স্বেচ্ছাচারী বলে সেগুলোকে মনে হয় যে লোকেরা তখন এই ভেবে বিস্মিত হয় এতদিন কি করে সেগুলোকে সহ্য করা হয়েছে—লোকেরা এটা ভুলে যায় যে তারা নিজেরাই তখন পর্যন্তও একইভাবেই সুবিধাজনক হবে তেমন ধারণা নিয়ে অন্যান্য আরো অনেক অসাম্যকে সহ্য করে যাচ্ছে। এই সত্যকে বুঝে নিয়ে শোধরাতে গেলে তাদের কাছে এমন মনে হবে যে তারা যেগুলোকে মেনে নিচ্ছে সেইগুলো অনেক বেশী বীভৎস, সম্প্রতি তারা যেগুলোকে ঘৃণা করছে সেইগুলোর তুলনায়। সামাজিক প্রগতির সামগ্রিক ইতিহাস এমন তথ্য দিয়ে পূর্ণ যে রীতিনীতি বা প্রতিষ্ঠান প্রতিনিয়ত একের পর এক রূপ ধারণ করছে—একই রীতিনীতিকে বা প্রতিষ্ঠানকে সামাজিক অস্তিত্বের জন্য প্রথমে মুখ্যত আবশ্যিক বলে অনুমান করে নেয়ার পর পরবর্তীতে সেইগুলোকেই আবার সার্বজনীনভাবে অন্যায় ও অত্যাচারী বলে নিন্দাবাদ করা হয়েছে। এমনটিই সর্বদা করা হয়েছে মুক্ত নাগরিক ও ক্রীতদাসের মধ্যে, ভদ্রলোক ও কৃষকের মধ্যে, সম্ভ্রান্ত ও ইতর জনের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে; এবং এরকমটাই করা হবে এবং আংশিকভাবে করা হচ্ছেও লিঙ্গ, জাতি ও বর্ণের ভিত্তিতে আভিজাত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে।

যা ইতিমধ্যে বলা হল সেই থেকে মনে হয় যে ন্যায়নীতি হল কতকগুলো নৈতিক প্রয়োজনের জন্য একটি নাম মাত্র। সমষ্টিগতভাবে গৃহীত এই প্রয়োজনগুলো সামাজিক উপযোগের দাঁড়িপাল্লায় অনেক অনেক উচ্চ স্থানে অবস্থান করছে। সেই জন্যই অন্য কিছুর তুলনায় সেইগুলোর প্রতি কর্তব্যবোধ একেবারে শীর্ষস্থানীয়, যদিও বিশেষ তেমন অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে যে-অবস্থায় অন্য কোন সামাজিক কর্তব্য এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে পড়তে পারে যেখানে ন্যায়নীতির সাধারণ নীতিমালার যে-কোনটিকে ছাড়িয়ে সেই সামাজিক কর্তব্য পালন করতে হয়। এইরূপে তেমন ক্ষেত্রে একটি জীবন বাঁচানোর জন্য কোন প্রয়োজনীয় খাদ্য বা বলপূর্বক নেয়া বা চুরি করা বা একমাত্র কর্তব্যরত সুযোগ্য চিকিৎসককে অপহরণ করা বা বাধ্য করা প্রভৃতি কার্যকলাপকে শুধুমাত্র গ্রহণীয় বলে গণ্য করা হয় না, সেইগুলো বরং তখন কর্তব্যের রূপ ধারণ করে। যেহেতু আমরা যা সদগুণের আওতায়

পড়ে না তাকে ন্যায়নীতি বলতে পারি না, সেহেতু এই সকল ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত এমন বলি না যে অন্যান্য নৈতিক নিয়মের জন্য ন্যায়নীতিকে বিসর্জন দিতে হবে। বরং এমন বলি যে যা সাধারণ ক্ষেত্রে ন্যায় হয়ে থাকে সেটা অন্যান্য নৈতিক নিয়মের কারণেই আবার বিশেষ ক্ষেত্রে ন্যায় হয় না। ভাষাকে এইভাবে নাড়াচাড়া করে ন্যায়নীতির উপর যে অপরাজেয় বৈশিষ্ট্যটি যুক্ত করা হয়েছে সেটাকে শীর্ষ স্থানেই রাখা সম্ভব হয়, আর এইভাবে কোন প্রশংসনীয় অন্যায় যে থাকতে পারে এই কথাটি মেনে নেয়ার আবশ্যিকতা থেকে আমরা মুক্ত থাকতে পারি।

আমার ধারণা, উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল সেটা নৈতিকতার উপযোগবাদী মতবাদের একমাত্র যথার্থ অসুবিধাটিকে দূরীভূত করেছে। এটা সর্বদাই সুস্পষ্ট যে সকল ন্যায়নীতির উদাহরণই আবার সুবিধাজনকতারই উদাহরণ। পার্থক্য শুধু এই যে ন্যায়নীতির সাথে একটি বিশেষ আবেগ জড়িত আছে, যেখানে সেই একই আবেগ সুবিধাজনকতার সাথে বিপরীতভাবে অর্থাৎ নেতিবাচকভাবে জড়িত। যদি এই বিশিষ্ট আবেগটিকে বিশেষ করে লক্ষ্য করা হয়, যদি এই আবেগের উৎস হিসেবে কোন বিশেষ ধরনের কিছুর আবশ্যিকতা না থাকে, যদি এটা শুধুমাত্র বিরক্তি প্রকাশের একটি স্বাভাবিক অনুভূতি হয়ে থাকে যেটা সামাজিক কল্যাণের দাবীর সাথে ব্যাপকতা লাভ করে নৈতিক রূপ ধারণ করে থাকে, এবং যদি এই আবেগটি ন্যায়নীতি যে-সকল কার্যকলাপের সাথে জড়িত সেই সকল কার্যকলাপের সকল শ্রেণীর সাথে শুধুমাত্র অবস্থান করে তা-ই নয় বরং এই আবেগকে সেইগুলোর সাথে সহ-অবস্থান করা উচিত বলে গণ্য করা হয়—তবে এমন সকল অবস্থায় ন্যায়নীতির ধারণাটি উপযোগবাদী নীতি-বিদ্যার বিরুদ্ধে পাহাড়ের মতো একটি বাধা হয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকবে না। ন্যায়-নীতিকে তেমন কয়েকটি সামাজিক উপযোগের উপযুক্ত নাম বলে গণ্য করা যায় যেগুলো অপরিসীমভাবে গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই কারণেই সেইগুলো শ্রেণীগতভাবে অন্য যে-কোন সামাজিক উপযোগের চেয়ে অধিকতর চরম ও বাধ্যবাধকতা নির্দেশক (যদিও ক্ষেত্রবিশেষে সেইগুলো অধিকতর চরম ও বাধ্যবাধকতা নির্দেশক না-ও হতে পারে)। সুতরাং, এই অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উপযোগগুলো প্রকৃতিগত-ভাবে যেমন একটি আবেগ দ্বারা সংরক্ষিত আছে তেমনি সংরক্ষিত থাকাও উচিত; এবং এই আবেগ যে মাত্রার বিচারেই ভিন্ন তা নয়, সেটা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারেরও হয়ে থাকে। মানব সুখ বৃদ্ধিকরণের ধারণাটির সাথে বা সুবিধা বৃদ্ধিকরণের ধারণাটির সাথে যে কোমল অনুভূতিটি জড়িত রয়েছে সেটার থেকে ন্যায়নীতির সাথে সম্পৃক্ত এই আবেগটি এই দিক দিয়ে স্বতন্ত্র যে এর নির্দেশের প্রকৃতি অধিকতর সুস্পষ্ট এবং এর অনুমোদনও অধিকতর শক্তিশালী।

BanglaBook.org

# পরিভাষা

## ইংরেজী-বাংলা

| | |
|---|---|
| **A** | |
| a priori | পূর্বতঃসিদ্ধ |
| absolute | চরম, পরম, চূড়ান্ত |
| affection | অনুরাগ |
| agent | কর্মকর্তা |
| analysis | বিশ্লেষণ |
| appreciation | সপ্রশংস উপলব্ধি |
| approbation | অনুমোদন |
| approval | অনুমোদন |
| appropriate | যথোচিত |
| Aristotle | এরিস্টটল |
| art | চারুকলা |
| association | অনুষঙ্গ |
| **B** | |
| bad | মন্দ, অশুভ |
| beauty | সৌন্দর্য |
| binding force | শর্তাবদ্ধ করার শক্তি |
| | বন্ধন শক্তি |
| benevolence | পরোপকার |
| **C** | |
| Chimera | পৌরাণিক দানব |
| Christian Ethics | খ্রীস্টীয় নীতিবিদ্যা |
| common sense | সহজ বুদ্ধি, |
| | সাধারণ বুদ্ধি |
| compassion | সহমর্মিতা |
| complex | যৌগিক, জটিল |
| conduct | আচরণ |
| consequence | পরিণাম |
| conscience | বিবেক |
| contradiction | বিরোধিতা |
| criterion | মানদণ্ড, মাপকাঠি |
| **D** | |
| defination | সংজ্ঞা |
| Deity | ঈশ্বর |
| derivative | অনুবর্তী |
| desirable | কাম্য |
| dialogue | সংলাপ |
| distributive | বিভাজক |
| divine | ঐশ্বরিক |
| **E** | |
| end | উদ্দেশ্য |
| emotion | আবেগ |
| Epicureans | এপিকুরীয় |
| | দার্শনিক |
| ethics | নীতিবিদ্যা |
| evil | মন্দ, অশুভ |
| excellence | উৎকর্ষ |
| existence | অস্তিত্ব |
| expediency | সুবিধা |
| **F** | |
| fact | তথ্য |
| faculty | কার্যকরতা বা শক্তি |
| feeling | অনুভূতি |
| fiction | অলীক কাহিনী |
| formula | সূত্র |

**G**

| | |
|---|---|
| generically | জাতিগতভাবে |
| God | ঈশ্বর |
| golden rules | স্বর্ণ-বিধান |
| good | ভাল, শুভ |

**H**

| | |
|---|---|
| habit | অভ্যাস |
| happiness | আনন্দ |
| health | স্বাস্থ্য |
| heterogenous | ভিন্নজাতীয় |
| homogenous | সমজাতীয় |

**I**

| | |
|---|---|
| Ideal | আদর্শ |
| idee mere | আদিম ধারণা |
| imagination | কল্পনা |
| in kind | শ্রেণীগতভাবে |
| inductive | আরোহবাদী |
| inherent | অন্তঃস্থ |
| intrinsic | অন্তর্নিহিত |
| intuition | স্বজ্ঞা |
| impulse | ঝোঁক |
| impunity | শাস্তিহীনতা |

**J**

| | |
|---|---|
| judgement | বিচার, সিদ্ধান্ত |
| judicature | বিচার কার্যসম্পন্ন করার ক্ষমতা |
| justice | ন্যায়পরতা |
| justify | যৌক্তিকতা প্রদর্শন |

**L**

| | |
|---|---|
| law | নিয়ম |
| legal | আইনগত, আইনসংক্রান্ত |
| legical | যৌক্তিক |

**M**

| | |
|---|---|
| moral | নৈতিক |
| motive | উদ্দেশ্য, প্রেষণা |

**N**

| | |
|---|---|
| natural | প্রাকৃতিক |
| necessity | আবশ্যিকতা |

**O**

| | |
|---|---|
| objective | বস্তুনির্ভর |
| obligation | কর্তব্যবোধ |
| ought | উচিত |

**P**

| | |
|---|---|
| Pain | বেদনা, যন্ত্রণা |
| perception | প্রত্যক্ষণ |
| pessimism | নৈরাশ্যবাদ |
| Plato | প্লাটো |
| pleasure | সুখ |
| possible action | সম্ভাব্য কাজ |
| potency | সুপ্ত ক্ষমতা |
| practical | ব্যবহারিক |
| preference | পক্ষপাতিত্ব |
| premises | পূর্বানুমান |
| primitive | আদিম |
| prove | প্রমাণ করা |
| prudence | দূরদর্শিতা |
| psychological | মনোবিদ্যক |

**R**

| | |
|---|---|
| reason | প্রজ্ঞা, বুদ্ধি |
| remorse | অনুশোচনা |
| resent | বিরক্তি প্রকাশ |
| Revelation | প্রত্যাদেশ |
| reward | পুরস্কার |
| rightness | নীতিসঙ্গততা |

| | |
|---|---|
| **S** | |
| sanction | অনুমোদন |
| self-evident | স্বপ্রমেয় |
| self-sacrifice | আত্মত্যাগ |
| subjective | মননির্ভর |
| summum bonum | পরম শুভ |
| **T** | |
| taste | রুচি |
| transcendentalist | অতি-প্রাকৃতিবাদী |
| **U** | |
| universal | সার্বজনীন |
| utilitarianism | উপযোগবাদ |
| **V** | |
| vice | অসদ্‌গুণ |
| virtue | সদ্‌গুণ |
| volition | অভীপ্সা শক্তি |
| **W** | |
| will | ইচ্ছাশক্তি |
| worthiness | যোগ্যতা |
| wrongness | নীতিবিগর্হিততা |

– সমাপ্ত –

The Online Library of Bangla Books
BanglaBook.org

# গ্রন্থপঞ্জী


Albee, E. **A History of English Utilitarianism,** New York, 1902

Ayer, A. J. "The Principle of Utility", **Philosophical Essays,** New York, 1955, p. 250-70.

Bain, A. **John Stuart Mill : A Criticism ; with Personal Recollections,** New York 1982.

Bentham, J. **Introduction to the Principles of Morals and Legislation,** chapters 1-4.

Berlin, **John Stuart Mill and the End of Life,** London, 1960.

Bosanquet, B. **The Philosophical Theory of the State,** London, 1899.

Britton, K. **John Stuart Mill,** Pelican Books, 1959.

Devidson, W. L. **Political Thought in England : The Utilitarians from Bentham to J. S. Mill,** New York 1916,

Devlin, **The Enforcement of Morals,** London, 1965.

Ewing, A. C. **Ethics,** New Work, 1953.

Grote, J. **Examination of the Utilitarian Philosophy.** Cambridge, 1970.

Halevy, E. **The Growth of Philosophical Radicalism,** London. 1949.

Krook. **Three Traditions in Moral Thought,** Cambidge, 1959.

Morlan, G. **America's Heritage from John Stuart Mill,** New York, 1936,

Nelf, E. **Carlyle and Mill : An Introduction to Victorian Thought,** New York, 1926.

Packe, M, St, J. **The Life of John Stuart Mill.** London, 1954.

Plamenatz, J. P. **The English Utilitarians,** Oxford, 1949.

Schneewind, J. B. (ed.) **Mill ; A Collection Critical Essays,** 1968.

Stephen, J. F, **Liberty, Equality and Fraternity.** London, 1873.

Stephen, L, **The English Utilitarians,** 3 vols. London, 1900.

Taylor. **The Philosophy of J S. Mill,** Oxford, 1953.